adorernauka@gmail.com

Adorer Nouka

# নষ্ট সময়ের উপাখ্যান

অভীক দত্ত

কিছু কথাঃ

একটা টালমাটাল সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। বিশ্বাসহীনতা, বিশ্বাসভঙ্গতা আর মানুষে মানুষে মারামারি এগুলি সব সাধারন ঘটনা এখন। সব দোষ রাজনীতিকদের ঘাড়ে ফেলে কি নিশ্চিন্তে আমরা চলাফেরা করি! আমরা ভুলে যাই, চেয়ারে বসা লোকজনেরা আসলে আমরাই। আমাদেরই বিভিন্ন রূপে আসলে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করে চলেছি।

নষ্ট সময়ের উপাখ্যান সেই আমাদেরই গল্প। আমাদের মত সাধারণ মানুষের গল্প। স্থান, কাল, পাত্র সমস্ত কিছুই যে কাল্পনিক তা বলাই বাহুল্য।

লেখক

২৩.১০.২০১৩

১।

বৃষ্টি সত্ত্বেও তরুণদার পিছু ছাড়ছিল না সুকান্ত, এত ভাল ব্যবহার বহুদিন দেখে নি সে। এমনিতেই এলাকার লোকজন সুরজিত শিকদারের ওপর বিরক্ত। বেশিরভাগ সময় বাড়ি থাকে না। থাকলেও লোক দিয়ে বলে পাঠায় বাড়ি নেই। বড় নেতা হয়ে গেলে এলাকার দাম পড়ে যায়।

এই পাঠকপাড়ার হালও সেরকম হয়েছে। সুরজিত প্রথম প্রথম যখন ভোটে জিতেছিল তখন বেশ কাজ বাজ হত। রাস্তা ঘাটও বেশ ভাল ছিল। ঠাট্টা করে সুরজিতদা বলতও সে কথা। বিহারের কোন নেতা নাকি বলেছিল হেমা মালিনীর গালের মত রাস্তা করে দেবে।হয়েও ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সুরজিতদা যত বড় নেতা হতে শুরু করল, রাস্তাঘাটের হাল তত খারাপ হতে লাগল। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও তথৈবচ।

সে কথাগুলিই বাড়ি বাড়ি ক্যাম্পেনে লোকেদের প্রায় কানে কানে বলছিল তরুণদা।

“অনেক তো দেখলেন দাদা, একটা দলই সব সময় জিতবে এ কেমন কথা? এবার একটু আমাদের দিকেও দেখুন”।

রেসপন্স খারাপ আসছে না। সেটা সুকান্ত বুঝতেও পারছে। আর খুশিও হচ্ছে। সুরজিত শিকদার জিতুক সে চায় না। আগের ভোটে চাইত, যখন ভেবেছিল পৌরসভার চাকরিটা হয়ে যাবে। পাঁচ বছর কেটে গেল স্রেফ ভোগা দিয়ে। “আজ ওখানে যাব তুইও আসিস”, “সি এম আসছে ফুলের দায়িত্ব তোর” ইত্যাদি ইত্যাদি।

বডিগার্ডই হয়ে থাকল বিনা পয়সায়।

তরুণদার সাথে দেখা আগের মাসে। হাওয়া বোঝা যাচ্ছে ক’দিন ধরেই। তরুণদাও আলাদা করে বলল “দ্যাখ অনেকদিন তো হল। কিছুই তো পেলি না। তার থেকে এবারটা আমাদের সাথেই থাক। দেখই না কি হয়”।

তারপর থেকেই সুরজিতের ফোন ধরা ছেড়ে দিয়েছে সুকান্ত।

একবার দেখা হয়েছিল অবশ্য রাস্তায়। তার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে সুরজিত বলেছিল “কিরে জার্সি পালটে ফেললি?”

পাশ থেকে তরুণই জবাবটা দিয়েছিল হাসি মুখে “হ্যা দাদা, এখন তো মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলও ভাড়াটে খেলোয়াড় খেলায়, এটা তো স্বাভাবিকই এখন”।

সুরজিত আর কথা বাড়ায়নি। ঘাঘু লোক। চুপ চাপ চলে গেল।

সুরজিতের ঝুলে যাওয়া মুখ দেখে বড় আনন্দ পায় সুকান্ত। বুকের যন্ত্রণাটা একটু কমে হয়ত।

শুধু চাকরি না।

সুরজিতের ন্যাওটা হবার আরেকটা কারণ ছিল, ওর মেয়ে ঝিমলি। সুকান্ত তখন ট্রেনে বই ফিরি করত রাতে পড়াত। ঝিমলি একবার ট্রেনে দেখে বলেছিল “এই কাজটা না করলে হয় না? এটা কিন্তু আপনাকে মানায় না”।

সুরজিতের বাড়ি যাওয়াও সেই থেকেই।

বহুদিন কারণে অকারনে বসে থাকত। বাড়িতে প্রচুর লোক আসত বলে সুরজিত আলাদা করে বুঝত না কিছুই। তবে নেক নজরে পড়ে গিয়েছিল। প্রায়ই ঝিমলির টিউশনের সময় পাঠানো হত তাকে।

ঝিমলির সাথে কথা কম হত না নেহাত।

দু মাস আগে ঝিমলির বিয়ে দিল সুরজিত। ডাকসাইটে এক ব্যবসায়ীর সাথে। ঝিমলিও কিছু বলল না। তারপর থেকেই বুকের জ্বালাটা টের পায় সুকান্ত।

বেশ কিছুদিন পার্টি অফিস আর সুরজিতের বাড়ি যেত না সে। তারপর ভাগ্যিস তরুণদা ডাকল...

২।

বাড়ির সামনেটা বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে। বহুদিন এরকম বৃষ্টি হয় না। আর সময় পেল না। কতদিন বাদে আজ আবীর আসবে ভিক্টোরিয়ায় আর আজকেই এমন বৃষ্টি হতে হল।

দুয়েকটা অটো যে যাচ্ছে না তা নয় তবে অটোতে উঠেও ভেজার শেষ হবে না। বরং শুরু হবে।

ফোনটা বাজছে।

আবীর। আজ আর আসবে না বলে দিল।

কি যে বাজে লাগছে। জামা কাপড় চেঞ্জ নিজের ঘরে এসে শুল সে। তাদের এলাকাটায় বৃষ্টি হলে জলের তলায় চট করে যায় না। বাবা সবাইকে গর্ব করে বলে যেদিন তাদের পাড়ায় জল জমবে সেদিন গোটা কলকাতা জলের তলায় চলে যাবে।

পেঁয়াজি ভাজার গন্ধ আসছে। সায়নীর ফেভারিট। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছিল না তার। প্রায় তিন মাস হয়ে গেল আবীর বেঙ্গালুরু গেছে। এতদিন বাদে দেখা হবার কথা ছিল। তাতেও এরকম বিপত্তি।

আবীরের চাকরি হলেই বিয়ে হবার কথা তাদের। ওদের বাড়ি থেকেও দেখতে আসার কথা। কিন্তু বেঙ্গালুরু পোস্টিংএর পর থেকে দৃশ্যটা পরিবর্তন হচ্ছে অস্বস্তিকর ভাবে। আজকাল ফোনও কমে গেছে।

ফোন কমলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। আগে সারারাত ফোন করত। কত্ত কথা!

ব্রেক আপ হবে নাকি তাদের? ভাবতেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ব্রেক আপ জিনিসটা এতদিন শুনেছেই শুধু। হলে কি হয় কে জানে!

এর আগে সেরকম ভাবে কারও সাথেই সেরকম সম্পর্ক তৈরি হয়নি তার। ফোনে ফোনে কারও কারও সাথে কথা হত তবে সেগুলি নিতান্তই মজা ছিল। এরকম সম্পর্ক ছিল না। কলেজ কেটে পার্কে, সিনেমা হলে বিভিন্ন জায়গায় আবীরের আগ্রহী হাত খেলাও করেছে অনায়াসে।

বাড়িতে আবীরের সম্পর্কে অবশ্য এখনও কিছু বলা হয় নি। মা জানে। বাবাকে এখনও বলে নি।

এম এ-র ফর্ম দিচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে। লাইনে দাঁড়াতে বড় কষ্ট তার।আগের বার দাদার বন্ধুরা হেল্প করেছিল। কিন্তু সে তো পাড়ার কলেজ। ইউনিভার্সিটির অনেক ঝামেলা।

তবে আবীর যদি দেরী করে খারাপ হয় না।একটু কষ্ট করে এম এ-টা হয়ে যাক, তারপরে দেখা যাবে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আবীর না এলেই বা কি হত? এখন তো জীবনটা একেবারে আবীর শূন্য হয়ে গেছে। তেমন তো খুব একটা পার্থক্য লাগছে না। পার্থক্য বলতে আগে যেভাবে একটা আগুন তৈরি হত এখন সে আগুনটা জ্বলে না আর। তাছাড়া সব একই আছে। পিয়ালি, পারমিতাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের বিয়েতে অনেক ছেলেরই কৌতূহলী নজর ছুঁয়ে গেছে তাকে।

কেউ কেউ এসে কথাও বলে। আবীর নামটা আছে বলে সে গুটিয়েই থাকে বেশ খানিকটা। অ্যাভয়েডও করে। দুয়েকটা সম্বন্ধও সযত্নে পাশ কাটিয়েছে ক'দিন ধরে।

মফস্বলের ছেলে আবীর। কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং করে চাকরি পেয়েছে। আবীরের সাথে দেখা তার মিস্টুদির বিয়েতে। কখন যে হালকা চোখাচুখি, অন্ত্যাক্ষরী থেকে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল সে বুঝতেই পারল না।

তখন আবীর খুব কেয়ারিং ছিল। এখন রোমিংয়ের টাকা না নতুন চাকরির কঠিন ট্রেনিং, কোনটা আবীরকে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল বুঝতে পারে না সায়নী। পরশু চলে যাবে আবীর। কাল যেন বৃষ্টি না হয়।

মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল সে।

৩।

“চাকরির বাজারটার খোলনলচে পাল্টাচ্ছে বুঝলি? এখন শুধু সরকারের পিওন হয়ে সারাজীবন কাটানোর দিন শেষ। নিজেকে কিছু করতে হবে...”

সিগারেটে সুখ টান দিতে দিতে কথাগুলি বলছিল তরুণদা। ভোটে খড়কুটোর মত উড়ে গেছে সুরজিত শিকদার। বিজয় মিছিলের পার্টও সারা। গলা অবধি বাংলা টেনে নেচে এসেছে তারা সুরজিতের বাড়ির সামনে দিয়ে। শোনা যাচ্ছে বাড়ি বেঁচে অন্য কোথাও পালাবার ধান্ধা করছে সুরজিত।

পার্টি অফিসে তরুণ ডেকেছিল আজ তাদের। ভবিষ্যতের দিশা দেখানোর মিটিং। তাকে আর পাঁচজন ছেলেকেও ডেকে পাঠিয়েছে। তারই ভাষণ চলছে। তরুণদা যেটা বলছে সেটা খারাপ লাগছে না সুকান্তর। দিনের পর দিন সুরজিতের বেগার খেটে সে ক্লান্ত। তাছাড়া এই এজেন্সিটা সবাইকে নিচ্ছে না। বেছে বেছে কয়েকজন মাত্র। তাও সবটাই তরুণদার সুপারিশে।

জয়েন করলে মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে। তাছাড়া প্রতি ফিক্সড ডিপোজিটে টেন পারসেন্ট কমিশন। নিজের পরিচিতি মহলে অনেকেই আছে। ধীরে ধীরে ডেটাবেসটা বাড়াতে পারলে আর দেখে কে।

তরুণদাকে ভগবান মনে হচ্ছিল তার। একদিন শুধু কলকাতা যেতে হবে। মেন অফিস থেকে ব্যাগ, ব্রোশিওয় আর নানা ডকুমেন্ট নিয়ে আসতে হবে।

জয়েনিং লেটার দিয়ে দিল তরুণদা।

ঢিপ করে একটা প্রনাম করে ফেলল সুকান্ত। তরুণদা হাসল। “শুকনো প্রণামে হবে রে পাগলা? পার্টি টা কই?”

আনন্দে সুকান্ত কেঁদে ফেলল “এখনই দাদা, কি খাবে বল?”

বাড়ি যাবার পথে সুরজিতের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বেশ কয়েকবার থুথু ফেলল সে।

* * * * *

কলকাতার মেয়ে নিয়ে বরাবরই সুকান্তর আলাদা একটা আকর্ষণ আছে। অত বড় শহরের মেয়েরা নিশ্চয়ই গ্রামের থেকে অনেক ভাল হবে।

খান পাঁচেক মেয়ে দেখা হয়েছে এখন অবধি। কোনটাকেই মনে ধরেনি। আসলে মেয়ে দেখতে বসলে কেন জানে না ঝিমলির মুখটা বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বার বার মনে হয় এমন একটা মেয়ে বিয়ে করতে হবে যে ঝিমলির থেকে অনেক ভাল দেখতে হয়। এর আগে পাশের গ্রামের দাশের মেয়েটাকে দেখা হয়েছিল। মেয়েটা দেখতে খারাপ না, কিন্তু টুয়েলভ ফেল। ঝিমলি আবার গ্রাজুয়েট। তার নিচে নামা যাবে না ঠিক করে নিয়েছে সুকান্ত।

গাড়ি ছাড়া কোথাও যাবার কথা সে ভাবতেও পারে না। আগে সাইকেলই অনেক ছিল। কিন্তু মা ভবতারিণী কোম্পানি তার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। প্রথমে একটা মোটর বাইক কিনেছিল সে। পরে চারচাকা। এসি অন করলে নিজেকে শাহেনশাহ মনে হয়। তরুণদাও আজকাল বড় গাড়িতে ঘুরছে।

তাদের অবস্থা অনেকেরই চোখ টাটায়। প্রতিদিনই একবার করে সুরজিতের বাড়ির সামনে গিয়ে একবার করে জোরে হর্ন বাজানো চাই তার। বেশ মজা লাগে। ব্রাঞ্চ অফিস থেকে আসার সময় পেটে একটু আধটু জল পড়লে মজাটা আরও বেশি হয়।

একদিন রাত একটার সময় সুরজিতের বাড়ির সামনে ছোট বাইরে করে এসেছিল। বেশ মজা লাগে। মনে একটা হালকা শান্তির আবহাওয়া ঘুরে বেড়ায়।

শালারা জীবনে কাউকে চাকরি দিতে পারল না উল্টে লোকের কাঠি করে গেল।

ভাবতেই ঘেন্না ধরে।

মাকুড়দা বলছে সামনের বৃহস্পতিবার একটা বি এ পাশ কলকাতার মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাবে। বেশ ভাল নাকি দেখতে।

কে যেন বলছিল কলকাতার মালগুলির শো রুম ভাল, গো ডাউন ঝুল হয়। সুকান্ত ঠিক করে ফেলেছে হোক খাওয়া, দেখা দিয়েই সুরজিতকে কাঁপাবে সে।

মাসে এখন পঞ্চাশ হাজারের ওপরে আয় তার। ভবতারিণীর ফিক্সড ডিপোজিটে আরও দু লাখ। সেই আগের সুকান্ত বিশ্বাস আর নেই এখন...

4.

বাড়িতে খুশির খবরটা দিয়ে আবীরকে চেষ্টা করে যাচ্ছিল সায়নী। গত দুদিন ধরে ফোনটা নট রিচেবল বলে যাচ্ছে। কি হয়েছে চিন্তাও হচ্ছে।

সে বুঝতে পারছিল না কি করে। অথচ এখন আবীরকে ফোন করে বলা উচিত তার "চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি আবীর শুনছ"।

একটা টিভি চ্যানেলের গানের অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ তার কাছে বেশ লোভনীয় কাজ। মাইনেও বেশ ভাল।

অথচ কাল অবধিও এই চাকরির ব্যাপারে কিছুই জানত না সে। এস জির ক্লাস ক্যান্সেল হবার পরে সুচরিতা জানিয়েছিল এই ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের কথা। নিতান্ত কৌতুহলবশেই চলে এসেছিল সে।

একটা বিষয় দিয়েছিল এক মহিলা তাদের "একটা ঝড়ের রাতে রবি ঠাকুরের সাথে তোমার সাক্ষাৎকার লেখ"।

বেশ মজাদার বিষয়। কি কি লিখেছে সেটাও সায়নী ঠিক মনে করতে পারছে না আনন্দের চোটে। তবে চাকরিটা পেয়ে বেশ লাফাচ্ছে। এরা বলে দিয়েছে সকালে স্ক্রিপ্ট লিখে ক্লাস করতে পারবে।

আপাতত এম এর কমপ্লিশন অবধি এরা খুব একটা চাপ দেবে না। নতুন কোম্পানি। ব্যবহারও বেশ ভাল। আর এরা বলেই দিয়েছিল ফ্রেশ ফেস খুঁজছে।

বাড়ি যেতে এখন খুব একটা খারাপ লাগছে না। গত কয়েকদিন বাড়ির পরিবেশটা খুব একটা সুবিধার না। বাবা রিটায়ার করেছে গত মাসে। দাদা এখনও জুতের কোন চাকরি পায় নি।

বিয়ের কথা গত তিন মাস ধরে সযত্নে কাটিয়ে যাচ্ছিল সে। আবীরের কথা বাধ্য হয়েই শেষ মেষ বাবা মা দুজনকেই বলতে হয়েছে।

টাকার কথা তুলে খোটার ব্যাপারটা আপাতত গেল। তবে সেটা তো বড় কথা না। আবীরকে এই খবরটা না জানালে তার তো আনন্দটা আর আনন্দ বলে মনে হচ্ছে না।

কলকাতায় যেদিন দেখা হল সেদিন অনেক কথা বলেছিল আবীর। প্রচুর চাপ। প্রতিদিন ট্রেনিং থেকে কারও না কারও চাকরি চলে যাচ্ছে, মেসের খাওয়া দাওয়ার মানও ভাল না, এর মধ্যে একবার খুব পেটখারাপ হয়েছিল সব কথাই হয়েছিল।

কিন্তু কবে সায়নীকে বিয়ে করবে সে কথাই হয় নি। সায়নীও আর জোর করে নি। সবে ঢুকেছে চাকরিতে। এখন আর জোর করার মানে কি।

সুচরিতার মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে। ওই নিয়ে এল তাকে অথচ পেল না। খারাপ লাগছিল সায়নীর। সুচরিতাকে বলল "চ' ফুচকা খাই"।

দশতলা বিল্ডিংয়ের সামনেটা এক ফুচকাওয়ালা দেদার বিক্রি করছে। ফুচকার কথা শুনে সুচরিতার মুডটা একটু চেঞ্জ হল। বলল "আজ কিন্তু তুই ট্রিট দিবি, আমি দেব না"।

সায়নী হাসল। বলল "থ্যাঙ্কস রে। খুব উপকার করলি আজ তুই। কত বড় উপহার তোকে বলে বোঝাতে পারব না"।

সুচরিতা কাঁধ ঝাকিয়ে তার মাথায় একটা চাটি মেরে বলল "ধুর ছাগল, বন্ধুদের আবার থ্যাঙ্কস দেয় নাকি, চল শুরু করা যাক"।

হাসল সায়নী। মেয়েটা অন্যরকম। তাদের সাথেই আরও দুজন এসেছিল অন্তরা এবং ইপ্সিতা। রেজাল্ট জানার পর দুজনেই চলে গেল। একটা শুকনো congrats জানানোর প্রয়োজন বোধও করে নি।

সায়নী জানে না, ওরা পেলে সে কি করত। সুচরিতা কিন্তু থেকে গেল। একটু অন্যরকম মেয়ে। কলেজের প্রথম দিনে ওই প্রথম যেচে এসে কথা বলেছিল। কলেজ যেতে না পারলে নোটস থেকে শুরু করে সব রকম সাহায্য করে।

ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় দুজনে প্রায় ষাট টাকার ফুচকা খেল।

5.

মাসের শুরুটা বেশ ব্যস্ত ভাবে কাটে সুকান্তর। একের পর এক কালেকশন আসতে থাকে। রেকারিং করে অনেকেই। কালেকশন এজেন্টরা দোকান থেকে প্রতিদিন যে টাকাগুলি তোলে সেগুলিও মাসের শুরুতে দিয়ে যায়। সব টাকা হেড অফিস পাঠাতে হয়। এবং অবশ্যই কমিশন এবং পার্টির বরাদ্দ কেটে রেখে। দুমাস আগে গোয়া ঘুরে এল সে।

তরুণদা শোনা যাচ্ছে মন্ত্রী হবে। হলে ঘ্যামা ব্যাপার হয়। প্রায়ই আজকাল তরুণদার সাথে ঘুরতে হচ্ছে তাকে। চা-পান-বিড়ি সবই তার পকেট থেকেই যায়।

তবে দ্বিধা করেনা দিতে। তরুণদা না থাকলে এত উন্নতি কল্পনাও করতে পারে নি সে। গত মাসে বাড়িটা দোতলা তুলে দিল। দাদা কিন্তু কিন্তু করছিল কিন্তু একটা এসি কিনে দেওয়ায় সেও খুব খুশি।

গত মাসে কলকাতায় গিয়ে এক মেয়ে দেখে এসেছে সে। পছন্দও হয়েছে। সমস্যা হল মেয়েটার হয়ত তাদের পছন্দ হয় নি। ময়লা রঙের সালোয়ার পড়ে এসছিল। মুখ গোঁজ করে ছিল। প্রশ্নের বেশি উত্তরও দেয় নি।

রান্না বান্নাও জানে না। সুকান্তর মনে হচ্ছে মেয়েটার প্রণয়ঘটিত কোন সমস্যা আছে। সে খুব একটা আশা করছে না এই ব্যাপারটায়।

সমস্যা হয়েছে অন্য জায়গায়। মেয়েটা যখন পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল, বুকে মৃদু ধাক্কা মত খেয়েছিল সে। মেয়েটা পেছন দিক থেকে একেবারে ঝিমলির মত লাগে। সেই হাঁটা।

মন খারাপ হয়ে গেছিল কলকাতা থেকে ফিরে। ঝিমলির সাথে কাটানো একটা বৃষ্টির দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বার বার।

টিউশন শেষে গাড়ি করে নিয়ে আসতে হচ্ছিল একবার ঝিমলিকে। মাঝরাস্তায় গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে যায়। গাড়ির স্টেপনিটাও পাংচার থাকায় ড্রাইভার গোবিন্দ একটা লরি ধরে বেরিয়ে যায় কাছের কোন গ্যারেজে।

সেই সময় নেমেছিল মরসুমের প্রথম বৃষ্টি। গত কয়েকদিন খুব গুমোট গরম যাচ্ছিল। বৃষ্টির তীব্রতাও ছিল বেশি।

সে আর ঝিমলি গাড়ির ভেতরে ছিল। বৃষ্টি একটু বেশি শুরু হতেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে একেবারে হিন্দি সিনেমার ঢঙে বৃষ্টিতে ভেজা শুরু করেছিল ঝিমলি। সারা গায়ের সব আনাচ কানাচ ফুটে উঠছিল বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া গায়ে।

সুকান্ত সেদিন বুঝতে পারছিল না কি করে। মুগ্ধ চোখে দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি।

সুরজিত শিকদার বৃষ্টিতে ভেজা মেয়েকে দেখে আলগোছে বলেছিল “ন্যাকামি যতসব”।

আর তাকে বলেছিল “ঘাস ছিঁড়তে পাঠিয়েছিলাম তোকে? মেয়েটা বৃষ্টিতে ভিজল আর তুই ক্যালানে কার্ত্তিকের মত সেটা দেখে এলি?”

আমতা আমতা করে ঘরে ফিরে এসেছিল সেদিন সুকান্ত। এই কলকাতার মেয়েটার হাঁটা চলা দেখে ঝিমলির মতই লেগেছে তার।

সত্যি কি প্রেম করে?

একেবারে হাল ছেঁড়ে দেয়নি সে। ফেরার সময় লোকাল পার্টি অফিসে মেয়েটার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে এসেছে সে। কেউই নিরাশ করেনি। ভাল পরিবার। বাবা কলকাতা কর্পোরেশনের রিটায়ার্ড কেরানী। কারও সাতে পাঁচে থাকেন না। মেয়ে পাড়ায় কারও সাথে বেশি কথা বলে না। চৌধুরী স্যার বলতেন মেয়েদের খালি ভূগোল দেখলে হয় না। ইতিহাসও দেখতে হয়। তা সে দেখার চেষ্টা করছে। বিষ্ণু কর্মকার নামে এক পার্টি কর্মীর সাথে আলাপ হয়েছে। তাকে আলাদা করে ডেকে পকেটে শ'পাঁচেক টাকা দিয়ে এসেছে সে। কয়েকদিন ফলো করে দেখাই যাক না।

যদি ছেলেঘটিত কোন সমস্যা না থাকে তবে এই মেয়েকেই বিয়ে করবে ঠিক করে ফেলেছে সে।

মেয়েটা পেছন থেকে ঝিমলির মত লাগে। এটা সে ভুলতে পারছে না।

৬।

বিষ্ণু কর্মকার ছেলেটা ভাল। সেটা সে নিজেও জানে। কিন্তু বাবা যেমন মাঝে মাঝে বাঁকা গলায় বলে “ভাল কি তেল দিয়ে ভেজে খাব”, তখন সে নিজেও কথাটা বুঝতে পারে।

দে বাড়ির সামনে দামী গাড়িটা দাঁড়াতে সে বুঝে গেছিল গল্প আছে কোন। চুপচাপ সেধিয়েছিল পার্টি অফিসের ভেতর।

ছেলেটা যখন নিজেকে পার্টির এক নেতার পরিচিত ইত্যাদি বলে তার কাছে সব জানতে চাইল তখনই সে ঠিক করে নিয়েছিল কাঁচা কাজ করা যাবে না।

টাকাটারও তো দরকার আছে জীবনে। দে বাড়ির লোকেরা কারও সাঁতে পাঁচে থাকে না। সবই দাঁড়িপাল্লায় মেপে কাজ। পাড়ার লোকের সাথে যত কথা ওদের শুধু অষ্টমীর অঞ্জলির সময়। পাশের পাড়ার ধীরেন ছক কষেছিল দুয়েকবার বেশি সুবিধা করতে পারেনি।

অঞ্জলির সময় আলটপকা দুয়েকটা কথা ছুঁড়ে দিয়েছিল মেয়েটার প্রতি, কিন্তু মেয়েটা বেশি পাত্তা দিল না। ধীরেন বিরক্ত হয়ে এসে বলেছিল “এ শালা নীরস মাল, কোন রস নেই, বেশি হেজিয়ে লাভ কি!”

এ ছাড়া ঠিক টাইমে অটো ধরে কলেজ যায়, ঠিক টাইমে ফেরে। এ মেয়ের জীবন একেবারেই থোড় বড়ি খাড়া।

তা সত্ত্বেও ওই বড়লোক ছেলেটার কথায় সে একটু সাসপেন্স রাখার চেষ্টা করেছিল শুরুতে। একেবারে প্রথমেই খাপ খুলে দিলে তারপর তো আর দাম পাওয়া যেত না। সেটা বেশ ভাল মালই কামানো গেল। ছোড়া বলেছে কিছুদিন ওয়াচে রাখতে। পরে আরও পাঁচশো দেবে। তাকে মোবাইল নাম্বারও দিয়ে গেছে।

সে ভাল ছেলে বলেই মেয়েটাকে একটু দূর থেকে ওয়াচে রাখছে দুদিন ধরে। পরে টি এ বিল নিয়ে নিলেই হবে।

তবে একেবারেই নিরামিষ। কলেজ যায়, কলেজ থেকে ফেরে।

বড় বড় হাই তুলে মেয়েটাকে দেখে মাথা নাড়তে নাড়তে ফোনে জানায় সুকান্তকে সে। ও পাশ থেকেও উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে বেশ খুশিই হয় বিষ্ণু। বুঝতে পারে কপালে আরও একটা গান্ধী নোট আসছে।

ক্লাস টেন অবধি পড়াশুনা করে ছেঁড়ে দিয়েছে বিষ্ণু। বাজারে একটা মুদির দোকান আছে। চলে না। সবই পাশের পাড়ার মলটা থেকে জিনিস কেনে। অস্ট্রেলিয়ার জাম, কানাডার পেয়ারা, হনোলুলুর কনডম কি নেই। মাঝে মাঝে দোকান বন্ধ রেখে দেখতে যায় বিষ্ণু। দেখে অবাক লাগে। কত এগিয়ে যাচ্ছে সব কিছু, বুঝতে পারে তার মুদির দোকান আর বেশি দিন চলবে না। সবাই শুধু মল থেকেই জিনিস কিনবে। পাড়ার রতন চাকরি পেয়েছে এখানে পার্টি থেকে। বলে সবই ভাল কিন্তু সারাদিন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পয়সাকড়িও বিশেষ সুবিধার না।

এই জন্য বিষ্ণু বেশি চাপ নেয় না। দাঁড়িয়ে থাকতে আর বড় আলসেমি। একটু ঘোরা ফেরা, এদিক অদিক যাওয়া এসব কাজ পেলে সে বেশ ভাল করবে। পার্টি অফিসে সে রোজ চুপচাপ গিয়ে বসে। শুরু থেকেই সে এই পার্টি করে। আগে লোকজন তেমন হত না। এখন রোজ রোজ নতুন নতুন চিড়িয়া আসছে। সবই আগের পার্টি থেকে পালিয়ে নিজের নিজের ধান্ধায় চলে আসছে।

তা খারাপ লাগে না তার মানুষ দেখতে। কত রকমের মানুষ আছে এই জগতে। কেউ চাকরির জন্য ল্যা ল্যা করে ঘুরে বেড়ায়, আবার কেউ বিয়ের চিন্তা করে বড় গাড়ি হাকিয়ে এসে লোককে উল্টে টাকা দিয়ে যায়।

ভাল হয়ে জীবনটা কাটানো কোন কাজের কথা না। বরং এই ফলো করার কাজের মত কোন কাজ পেলে সে মন দিয়ে করতে পারে। পয়সা কড়ি এরকম পাওয়া গেলে দোকানটা রণজিতদার কথা মত ভবতারিণী কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া যাবে। আজকাল ওরা বেশ ভাল দামেই জমি বাড়ি দোকান কিনে নিচ্ছে।

তার ছোট দোকানের প্রায় পনেরো লাখ টাকা দাম উঠেছে। সেরকম জুতের কাজ পেলে দোকান বেঁচে টাকাটা ওই কোম্পানিতে ফিক্স করে দেবে ঠিক করে রেখেছে সে।সাত বছরে পনেরো লাখ হবে ষাট লাখ।

ভাবা যায়?

৭।

সুরজিত শিকদার বাড়ির বাইরে বসে ছিলেন। গরম কালের সন্ধ্যে। এককালে এই সময়টা বাড়ি ভর্তি লোক থাকত। কেউ সার্টিফিকেট চাইছে, কেউ এসেছে একটা ডেডবডি বাড়ির সামনে রেখে ঘাটকাজের জন্য সাহায্য চাইতে, আর গাদা খানেক লোক চাকরির জন্যে। এখন কেউ নেই। প্রথম প্রথম কদিন ভারী ফাঁকা ফাঁকা লাগত।

দমবন্ধ লাগত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে থাকতেন।

তার ওপর একমাত্র মেয়েটারও বিয়ে হয়ে যাবার ফলে একা লাগত আরও বেশি। গিন্নি গেছে বাপের বাড়ি। আজকে একাই থাকতে হবে। বল্টুকে বলেছেন আসতে। একমাত্র সেই আছে এখনও পাশে। কবে চলে যাবে বাকিদের মত তা জানেন না।

মোবাইলটা বাজছে। দেখলেন পার্টির ওপর তলা থেকে ফোন করছে। ধরলেন না। গত কদিন ধরে কানাঘুষো শুনছেন পার্টি এক্সপেল করে দিতে পারে বেআইনি কাজের জন্য। স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদিও আছে।

খুব একটা দুঃখ পাবেন না তেমন হলে। এখন রাখলেই কি আর বের করলেই বা কি। পার্টি এখন সাইনবোর্ড হয়ে গেছে। বুড়োগুলোর কাজ শুধু খিটখিট করে লোকের ভুল ধরে বেড়ানো। এককালে যখন পদে ছিলেন, এরাই চিঠি দিয়ে লোক পাঠাত, চিঠিতে লেখা থাকত

"স্নেহের সুরজিত, পত্রবাহক অত্যন্ত কর্মঠ একজন পার্টিকর্মী, দেখো যদি কোনভাবে সাহায্য করতে পার"।

এখন তারাই ভুল ধরে বেড়াচ্ছে তার। হাতকাটা খোকনকে নাকি তিনিই আশকারা দিয়েছেন। মুখ কুঁচকে একটা চার অক্ষরের গালাগাল দিলেন।

দরকারের সময় সবাই তো মনের সুখে ব্যবহার করে নিয়েছে। আর এখন সব সতী সাবিত্রী সাজছে। আগের বারের ভোটে যখন জিতে আসলেন তখন তো ওই খোকন গিয়েই তোদের প্রনাম করত, অতই যদি বাজে হল, তখন নিলি কেন প্রনাম?

এখন নাকি ডাক পড়েছে নোংরা জল বের করে দেবার। আরে নোংরা তো তোরা ওই বুড়োগুলো। সারাজীবন পদ আগলে বসে থাকবি, পার্টি কর্মীদের টাকায় গাড়ি চড়ে বড় বড় বক্তৃতা ঝাড়বি আর নোংরা জল বের করবি। সবার আগে তোরা পার্টি ছাড়। তাহলেই দেখবি কি তাড়াতাড়ি শুদ্ধিকরণ হয়ে যাবে।

ফোনটা আবার বাজছে। খোকন। ধরলেন এবার।

"দাদা, পলাশ পাঁজারা টার্গেট করেছে আমায়, যখন তখন নামিয়ে দেবে বলছে। কিছু একটা কর"।

কি বলবেন বুঝতে পারলেন না তিনি। খোকন উড়ে গেলে তার আর কি মূল্য থাকবে। একটা শেষ চেষ্টা তো করতেই হবে।

ফোনটা রেখে এবার তরুণকে ফোন করলেন। একবার রিংয়েই ফোনটা ধরে নিল তরুণ

- বলুন দাদা কেমন আছেন?

- ভাল। তুমি কেমন?

- এই দাদা যেমন রেখেছেন। পার্টি, এলাকা সবই প্রায় একা হাতে সামলাচ্ছি, শুনছি লোকসভায় কোন এক আর্টিস্টকে প্রার্থী করা হবে। মন মেজাজ খারাপ দাদা। এত করলাম, তবু দেখুন কোন ভ্যালু নেই।

মেজাজটা খানিকটা খিচড়াল সুরজিতের। ব্যাটা ক্লাস টেন ফেল, স্বপ্ন দেখে আবার এমপি হবার। কিন্তু গলাটা একই রাখলেন। দরকারটা যখন তার।

- তোমাকে একটা কারণে ফোন করলাম তরুণ।

- হ্যা দাদা বলুন।

- কাছে কেউ নেই তো?

- না, এখন একটু আলাদাই আছি। বলুন না।

- খোকনকে শুনছি পলাশরা টার্গেট করছে। এটা কি ব্যাপার বল তো। আমাদের ভেতর কিছু তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে।

- হু। খবরটা আমার কানে এসেছে। তবে দাদা খোকনকে মাঝে মাঝে একটু আমার সাথে দেখা করতে বলুন। তাহলে তো এই ভয়গুলো থাকে না। অ্যাটলিস্ট বুঝতেই পারছেন, হা হা হা হা...

দেঁতো হাসি হেসে ফোনটা রাখলেন সুরজিত, মেজাজটা বাজে হয়ে গেল আরও। এরমানে খোকনকে এবার তরুণের শেল্টার নিতে হবে। গোপনে গোপনে নিয়েছিল নাকি তা অবশ্য জানেন না তিনি।

সুকান্ত আজকাল বড় বিরক্ত করছে। মাঝে মাঝে মাঝরাতে ল্যান্ড লাইনে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। বাঞ্চোদটা আগে এই ঘরে ভক্ত হনুমানের মত হাতজোড় করে বসে থাকত। আর ও জানে না যে তার ফোনে সি এল আই লাগানো আছে। তাকে কয়েকজন বলেছিল ও নাকি ঝিমলিকে ভালবাসে। শুরুতে পাত্তা দেন নি তিনি। উল্টে ওর ভালবাসার খবর শুনে ওকে ঝিমলির বডিগার্ডের কাজেই লাগিয়েছিলেন তিনি।

আজকাল আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। ফোল, আরও ফোল...

দিন সবার আসে। সুরজিত ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। অনেক অঙ্ক বাকি আছে এখনও।

রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু হয় না।

৮।

সায়নীর প্রচন্ড টেনশন হচ্ছে। তার সামনে তমাল সেন বসে আছেন। যার চারটে টিভি কোম্পানি, পাঁচটা খবরের কাগজ। তার উপর মা ভবতারিণী কোম্পানির মালিক। শোনা যায় পঞ্চাশের ওপর বয়স। দেখে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পয়ত্রিশ ছত্রিশের কোন যুবক বসে আছেন। তাকে কেন ডেকে আনা হয়েছে সেটাও বুঝতে পারছে না।

আজ দুপুরে অফিসে আসার সাথে সাথে কণিকাদি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কণিকাদি তাদের উপরওয়ালা। বলেছিল সন্ধ্যে আটটায় আজ স্যার তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বেশি রাত হয়ে গেলে অফিসের গাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে।

তারপর থেকেই টেনশানের চূড়ান্ত। এখন তমাল সেনের সামনে বসে আরও বাড়ছে সেটা। তার সাথে আরও দুজন মেয়েকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, চ্যানেল ফাইভের নিউজ রিডার দেবারতি বারিক এবং সোনা মিউজিকের তুলিকা বসাক।

এই ফ্লোরে কোন পুরুষ কর্মচারী নেই। শোনা যায়, তমাল সেন নারীদের প্রচন্ড সম্মান করেন। মা ভবতারিণীর এক

বিরাট ফটো বসার ঘরে।

ল্যাপটপে কাজ করতে করতে সায়নীকে দিয়েই শুরু করলেন তমাল সেন। “সায়নী রাইট? আপনার স্ক্রিপ্ট আমি শুনেছি। ইনফ্যাক্ট সকালের প্রোগ্রামে আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে।আমাদের আপনার মত এফিসিয়েন্ট স্ক্রিপ্ট রাইটার চাই। কাল থেকে আপনি আমাদের নিউজ চ্যানেলে কাজ করবেন। আপনাকে দুটো প্রোমোশান দেওয়া হল। আপনার মাইনে আরও কুড়ি হাজার টাকা বেশি হল। প্লাস আপনি যাতায়াতের জন্য গাড়ি পাবেন”।

সায়নীর নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। এতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এতটা সে কোনদিন সুদূর সুখস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। এ বলে কি? কিন্তু তবু মনে একটা কাঁটা খচখচ করছিল। আমতা আমতা করে বলেই ফেলল সে।

“কিন্তু স্যার, আমার এম এ টা এখন চলছে, ওটা শেষ না করে ফুল ফ্লেজড কি করে কাজটা করব? এখনো তো পুরো দমে নামতে পারছিলাম না”।

ল্যাপটপটা ছেড়ে তার চোখে চোখ রাখলেন তমাল সেন।

“এম এটা ছেড়ে দিন। আপনি ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। খুব শিগগিরি দুটো ন্যাশনাল চ্যানেল কিনছি। একটা এফ এম চ্যানেলও প্ল্যানে আছে। আপনাদেরই তো সব সামলাতে হবে। আমার ইচ্ছা আছে, এক এক করে সব চ্যানেল কিনে নেব।ফিল্ম, ফিশারি, রিয়েল এস্টেট সব কিছু তে রাজ করব আমরা। সব হবে আমার। তোমরা আমার জন্য এটুকু স্যাক্রিফাইস করতে পারবে না?”

শেষটা তুমি শুনে আর তমাল সেনের মুখে এই কথাগুলি শুনে আর দুবার ভাবল না সায়নী।

এরপরে আর কিছু বলা যায় না। বলেই ফেলল সে “ঠিক আছে স্যার, আমি তৈরি। এম এ-টা পরে না হয় দেখা যাবে”।

খুশি হয়ে উঠলেন তমাল সেন “দ্যাটস দ্যা স্পিরিট। এগিয়ে চলো, আমি তোমাদের সাথে আছি। নাও ইউ মে গো”।

লাফাতে লাফাতে ঘরের বাইরে বেরল সায়নী। এম এ টা ছাড়ার সাথে আরও একটা ভাবনাও এই সময় মাথায় চলে এল। ক’দিন ধরে এটা নিয়ে ভেবেছে সে। অবশেষে আজকে শেষ সিদ্ধান্তে চলে এল।

যাও আবীর বোস। তোমায় আজ দিলাম ছুটি।

আর তোমার নট রিচেবল ফোনে কাল থেকে সায়নী আর কোন ফোন করবে না...

৯।

মুসলিম মহল্লাগুলি বরাবর অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে তরুণ। আগের আমলের শেষ থেকেই এদের প্রচন্ড তোষামোদি করা শুরু হয়েছে। এ আমলে বেশি। ভোটটাই আসল কারণ সেটা না বলে দিলেও চলে। আদতে শিক্ষা স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত নয় কেউই। সবাই মাথায় একটা কাপড় টেনে নামাজ পড়তে পারলেই বুঝতে পারছে এই বোকাসোকা অশিক্ষিত জাতটাকে ভাল ভাবে বশে রাখা যায়।

এদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত তারা মাঝে মাঝেই বেচাল কথা বলছে বটে কিন্তু সেটা বাকিদের জয়ধ্বনিতে চাপা পড়ে যাচ্ছে। কি একটা কমিটি হয়েছিল ক'বছর আগে, তাদের রিপোর্টের ওপর বেস করেই তারা ক্ষমতায় এসেছে। এদেশে মুসলিমরা একটা বিরাট শক্তি।

স্টেজের পাশের মাংসের দোকান থেকে একটা চর্বির গন্ধ ছড়াচ্ছে। আগে এই গন্ধে বমি চলে এতো, তবে এখন মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হচ্ছে।

আজ শঙ্কর ঘড়ুই আসবে। একটা মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর হবে। সে প্রথমে একটা স্কুলের প্রপোজাল করেছিল কিন্তু উপরমহল খারিজ করে দিয়েছে সে প্রস্তাব। বলেছে মেইনস্ট্রিম স্কুলে কিছু হয় না। হলে মাদ্রাসা হোক। ভোটের ব্যাপার আছে। সাধারন বিদ্যা নিয়ে ভোট হয় না।

শঙ্কর ঘোড়ুই বড় নেতা। সিনেমার হিরোরা যেমন পাড়া গাঁয়ের প্রোগ্রামে লাস্ট সীনে এন্ট্রি মারে শঙ্কর ঘোড়ুইও সেরকম।তার আগে আসর গরম রাখতে হচ্ছে তাদের।

একটা আবেগঘন বক্তৃতা দিল তরুণ। "বাংলার মাটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির, এখানে আরও মাদ্রাসা খোলা হবে ইনশাল্লাহ" ইত্যাদি ইত্যাদি। তার বক্তৃতার মাঝেই শঙ্করের গাড়ির বনেট দেখা গেল। সে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। শঙ্করের নজরে আসতে হবে এখন। সামনে লোকসভা। ওই ভাড়াটে প্রার্থীর জায়গায় তার একটা আউটসাইড চান্স আছে কদিন ধরে কানাঘুষোয় শুনছে সে।

বক্তৃতার মাঝে মাঝে গোরুর মাংসের গন্ধয় বমি আসব আসব করছিল তবু সে ম্যানেজ করে যাচ্ছিল।

শঙ্কর ষ্টেজে ওঠার সময় হাততালির শব্দে তার বক্তৃতা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। তবু সে যতটা পারে গরম করার চেষ্টা করছিল। ষ্টেজে উঠে শঙ্কর তাকে চোখ টিপে ইশারা করল টাইম কম আছে। সে তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ করে শঙ্করের পাশে গিয়ে বসল।

শঙ্কর তার কানে কানে বলল “সামনে লোকসভা।আমি কিন্তু তোমার নাম একটু হাওয়ায় ভাসিয়েছি”।

তরুণ বিগলিত হল “থ্যাঙ্কস দাদা। এটা আমার ভীষণ সৌভাগ্য”।

শঙ্করের নস্যি নেওয়া অভ্যাস আছে। ষ্টেজের মধ্যেই এক টিপ নিয়ে তার কানের কাছে আরেকবার মুখ এনে বলল “কিছু ছেলেকে ট্রাফিকে ঢোকাতে হবে। কি করা যায় বলত?”

তরুণ আরেকবার গলে গেল “কি যে বল দাদা, তুমি ছোট ভাইকে আদেশ করবে। কালকেই পাঠিয়ে দিও। হয়ে যাবে”।

খুশি হল শঙ্কর। এরকম জো হুজুরই তার পছন্দ। বলল “ব্যাবসা ভাল চলছে তো? আজকাল কালেকশান কেমন?”

তরুণ হাসল “তা দাদা পোস্ট অফিসে এবার লাল বাতি জ্বেলে যাবে। সবই মা ভবতারিণীর কৃপা”।

“গুড। কোনরকম সমস্যা হলে ডাইরেক্ট আমাকে ফোন করবে”।

বক্তৃতা দিতে উঠল শঙ্কর। তরুণ দেখছিল মঞ্চের সামনে অগণিত জনগণ। সবার একই চাহিদা। চাকরি।

ওই ম্যাজিক ওয়ার্ডের অপেক্ষায় সবাই চাতকের মত তাকিয়ে আছে। এই অঞ্চলটা এখনও ধরা হয় নি। এখানে অবশ্য মা ভবতারিণী নামটা চলবে না। সুকান্তকে বলতে হবে “রহমান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ”কে এখানে ব্যবসা শুরু করাতে হবে। পাঁচ হাজার দু বছরে দশ হাজার। ছোট স্কিম গরীব অঞ্চলে চলে বেশি।

এলাকা গরম করে গাড়িতে ওঠার আগে শঙ্কর ঘোড়ুই তরুণকে আলাদা করে ডাকল। “শুনছি খোকনকে নাকি তুমি সাবাড় করতে বারণ করেছ?”

বেশ খানিকটা চমকাল তরুণ। কিন্তু বুঝতে দিল না। এরা এত খবর পায় কোত্থেকে কে জানে। গলা নামিয়ে বলল “হ্যাঁ দাদা, সুরজিত শিকদারের স্পেশাল রিকোয়েস্ট এসছিল। শুনেছি ওকে এক্সপেল করবে। বেশ কিছু লোক এখনও ওর কথা শোনে। যদি সামনের ভোটে বুঝতেই পারছেন”।

চিন্তিত মুখে শঙ্কর বলল “মন্দ বলনি। থাক তবে। কিন্তু নজরে রেখো”।

গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে তরুণ বলল “সে দাদা আর বলতে। বেকায়দায় দেখলেই নামিয়ে দেব। চিন্তা নেই”।

হুটার বাজিয়ে বেরিয়ে গেল শঙ্কর ঘোড়ুইয়ের গাড়ি। তরুণ কপালের ঘাম মুছল।

পার্টির সব জায়গায় একটা করে সি আই ডি বসে রয়েছে। সব খবর এক্কেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। এই খবরটা কে দিতে পারে? চিন্তিত হল সে।

১০।

অনেকদিন পাঠকপাড়ার লোক এমন বিয়ে বাড়ি দেখে নি। বাড়ির সামনের মাঠটার প্রায় পুরোটাই ব্যবহার করেছে সুকান্ত। আলোর রোশনাই, আর বাজনার শব্দে গোটা এলাকা সরগরম হয়ে উঠেছে।

মা ভবতারিণী কোম্পানি কলকাতা থেকে ক্যাটারার পাঠিয়েছে। তিন রকম আলাদা আলাদা খাবার ব্যবস্থা। মোগলাই, চাইনিজ এবং বাঙালি। কেউ কেউ তিনটেতেই ঢু দিচ্ছে। ঢালাও ব্যাপার। বিষ্ণু কর্মকার কিছুটা চমকে গেছে ব্যাপার স্যাপার দেখে। এরকম বিয়ে বাড়ি সে কলকাতাতেও বহুদিন দেখে না। তাদের পাড়া তো এমনিতেও মড়া পাড়া। বিয়ে বাড়ি বলতে লরি প্যান্ডেল, আর কপাল ভাল থাকলে খাসি জোটে। শেষ কবে এরকম বিয়ে বাড়ি দেখেছে সে মনে করতে পারছিল না। তিরিশ গ্লাস লাল সরবত আর কয়েকশো পকোড়া ইতিমধ্যে সে গলাধঃকরণ করেছে। সুকান্ত তার বিশেষ আদর যত্ন করতে বলেছে তার লোকজনকে। শ্বশুরপাড়ার লোক বলে কথা।

পলাশ হাজরা বলে একজন তার সাথে সাথে ঘুরছে। তাকে তালুই বলে ডাকছে। সে আবার কোত্থেকে একটু টেনে এসছে। তাকে অফার করেছিল, সে খায়নি। একটু ইচ্ছা যে করছিল না তা নয় তবে ঘরে ফিরতে হবে বলে রাত হলেও সে ভেবে খায় নি। বাবার এই এক সমস্যা। কোথাও যাবার আগে একটা কথা বলে দেয়। যত রাত হবে হোক, বাড়ি ফিরতেই হবে।

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে বলছিল পলাশ হাজরা "বুইলে তালুই, সুকা আমাদের দারুণ ছেলে। ছোটবেলায় পড়াশুনায় টপ ছিল। কত মিষ্টি বিলাত ওর বাপ রোজকার বছর। সে ছেলে যে সাইন করবে সে তো জানা কথা"।

সুকান্ত যে ভাল ছাত্র ছিল জানত না বিষ্ণু। তবে মদের ঘোরে বকছে বলে বেশি পাত্তাও দিল না।

একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর থেকে একজন বয়স্ক লোক নামলেন। পলাশ বলল "ওই দেখ শুয়োরের বাচ্চাটা আসছে"।

বিষ্ণু বলল "কে?"

পলাশ হিক্কা তুলতে তুলতে বলল "সুরজিত শিকদার। শালা জালিস্য জালি মাল। সুকাকে দিনের পর দিন চাকরি আর মেয়ের লোভ দেখিয়ে ভূতের বেগার খাটাত"।

এতদিন দে বাড়ির মেয়ের খবর জানতে জানতে মনটা এক মুখী হয়ে গেছে বুঝতে পারছিল বিষ্ণু। সুকান্তর এই নতুন খবরটা পেয়ে আগ্রহী হল খানিকটা। প্রচুর লোক আসতে শুরু করেছে। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে বসার জায়গা নিয়ে হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যেই বলে চলল পলাশ "এলাকার রাজা ছিল ওই হারামিটা। সব শালা গিয়ে ওর পা চাটত। এর মধ্যেই অঙ্কে না কি একটা সায়েন্সের সাবজেক্টে বি এসসি করে বসে ছিল সুকান্ত। বাপ মরে যাওয়ায় টাকা হাত খালি হয়ে যায়। সকালে ট্রেনে ফিরিওয়ালা আর রাতে সুরজিত শিকদারের পা ধরে বসত আমাদের সুকা। একসময় ফিরিওয়ালার ব্যবসাও ছেড়ে দিল। কেউ কেউ বলে সুরজিতের মেয়ের কথায়। কিন্তু চাকরি দিল কাকে জানিস ওই সুরজিত? নিজের ভায়রার ছেলেকে। আর মেয়ের বিয়ে দিল অন্য জায়গায়। তারপর থেকে ছেলেটা পাগল পাগল হয়ে থাকত"।

সুরজিত শিকদার তার হাতের নাগালেই বসে ছিল। বিষ্ণুর ইচ্ছা হচ্ছিল জুতোটা খুলে ছুঁড়ে মারে। অভদ্রতা হবে ভেবে মারল না। সুকান্ত একটা দামী স্যুট পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুরজিতের সাথেও হেসে হেসে কথা বলছে। সাফল্য মানুষকে অনেকখানি বদলে দেয়। সে নিজেকে বোকাসোকা মানুষ বলেই জানে। তবু সুকান্তর সাফল্যের জ্যোতি তাকেও স্পর্শ করছিল।

হুটার লাগানো গাড়ি একটার পর একটা আসা শুরু হল। কলকাতা থেকে বড় বড় নেতাদেরও আসার কথা। বিষ্ণু একটা কোণায় দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল। তাদের কন্যাযাত্রীদের বাসও এসে পড়ল। চারিদিকে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব।

মাঠের মাঝখানে একটা বিরাট ফোয়ারা, তাকে ঘিরে ধরে একের পর এক আতসবাজির প্রদর্শনী বিষ্ণুকে এক ঘোরের মধ্যে নিয়ে গেল।

এর মধ্যেই একটা বিরাট গাড়িতে করে নামলেন এক ভদ্রলোক। সাফল্যের জ্যোতিতে ইনিও ঝলমল করছিলেন।

একে চিনতে পারছিল না বিষ্ণু। এই ভদ্রলোক নামতে দেখা গেল সব লাল বাতিতে আসা লোকই বেশ খাতির করে কথা বলছে। সুকান্তও কোত্থেকে ছুটে এসে বউ দেখাতে নিয়ে গেল। বেশ বড় এক খানা ঝলমলে সোনার হার দিলেন ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পলাশের দিকে তাকাল বিষ্ণু। পলাশ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল “তুমি কি কলকাতার লোক হে? একেও চেনো না? আরে ইনিই তো এখন আমাদের দেশের এক নম্বর লোক। সুকান্তর মালিক, এ তোমাদের মা ভবতারিণী কোম্পানির মালিক তমাল সেন হে”।

লজ্জায় পড়ে গেল বিষ্ণু। এ হে হে, এটা বাজে মিস হয়ে গেল। সে দূর থেকেই তমাল সেন কে দেখতে লাগল।

কিন্তু এক অদ্ভুত অস্বস্তি তাকে ঘিরে ধরতে লাগল। এই লোকটাকে সে আজই প্রথম দেখছেনা। আগেও দেখেছে। কোথায়? কিছুতেই মনে করতে পারলনা বিষ্ণু।

11.

বাড়িতে বাবা সম্বন্ধের জন্য জোর দিচ্ছে ক'দিন ধরে। তার যোগ্য সঙ্গত করছে মা। অথচ সায়নী ওদের বুঝিয়ে উঠতে পারছে না তার এখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। নিউজ ডেস্ক থেকে তমাল সেন তাকে সোজা তুলে এনেছে ভবতারিণীর মেন অফিসে। প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা এসে জমা হচ্ছে। হিসেব করে কম্পিউটারে তোলা, বিভিন্ন জায়গায় ফোন করা, সব কিছুর জন্য তমাল সেনের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সহকারী হয়ে উঠেছে সে। প্রথম প্রথম আহেলি ম্যাডাম সব করত। আজকাল কেন জানে না সেন স্যার ওনাকে সহ্য করতে পারেন না।

তাকেই সব সময় ডেকে পাঠান। বেশির ভাগ সময় রাতের দিকে অফিস আসেন বলে তাকেও থেকে যেতে হয়।

বাবা মা আগে চিন্তা করত।

এখন বিশেষ করে না। এত বড় কোম্পানির নাম কাগজে টাগজে তো পড়ে জানা গেছেই তাছাড়া রোজ রোজ নতুন নতুন প্রজেক্ট, কাগজ, টিভি চ্যানেলের পেছনে তাদের মেয়েরও সামান্য অবদান আছে জেনে তারা খুবই খুশি। এলাকার সবাই বেশ ঈর্ষাই করছে আজকাল।চাকরির উমেদাররা আজকাল সায়নীর ফোনেও পৌঁছে যাচ্ছে। মার মাসতুতো পিস শ্বশুরের খুড়তুতো ভাগনের নামও আজকাল তাকে জানতে হচ্ছে।

খুশিই হয় সায়নী। এককালে সামান্য কেরানী বাবাকে আত্মীয়েরা কেউই সেভাবে পাত্তা দিত না। তার কল্যাণে আজকাল বাজারদর বেশ ভালই বেড়েছে। এককালে বাড়িতে চিংড়ি, ইলিশের কথা ভাবাই যেত না। আজকাল সেসব আকছার হচ্ছে।

মাঝে মাঝে কিছু ঝক্কিও সামলাতে হচ্ছে। একদিন এক বাক্স টাকা তাকে স্যার বললেন নিজের কাছে রাখতে। সেসব বাড়িতে লুকাতে একটু টেনশানে পড়তে হয় তাকে। কিছু নথিপত্রও নিজের কাছে রাখতে হয়েছে। তবে সে বুঝতে পারে তাকে বিশ্বাস করেন বলেই স্যার এসব রাখতে দিয়েছেন।

কথা আছে পরের সপ্তাহে দার্জিলিংএ তাদের নতুন রিসর্টে স্যারের সাথে তার যাবার। সে চেষ্টা করছে কাটিয়ে দিতে। সংযুক্তাদি, আহেলি ম্যাডামেরও যাবার কথা আছে। না গেলে স্যার রাগ করবেন, কি করবে বুঝতে পারছে না। একবার ভেবেছিল মা কে নিয়ে যাবে পরে চিন্তা করে দেখল অফিস ট্যুরে মাকে নিয়ে গেলে হাসাহাসি হতে পারে। এর মধ্যে তমাল সেন তাকে ডেকে জানিয়েছেন ভবতারিণী গ্রুপ ফিল্ম প্রডাকশানে নামবে। একটা বড় ক্রু যাবে দার্জিলিংএ তাদের রিসর্টে। ব্যবসা ছড়াচ্ছে আলোর গতিতে। এসব দেখতে দেখতে সায়নী মাঝে মাঝে নিজেকে চিমটি কেটে দেখে সে স্বপ্ন দেখছে না তো? সে কোথায় ছিল আর কয়েকদিনের মধ্যে কোথায় পৌঁছে গেল!

তাদের অফিসের ফ্লোরে তমাল সেন ছাড়া কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। তা তিনি যখন আসে বেশির ভাগ দিনেই সায়নী ছাড়া আর কেউ থাকে না। প্রথম প্রথম ভয় পেত সে। ভাবত একা পেয়ে হয়ত কোন অসভ্যতা করে ফেলবেন স্যার। কিন্তু ধীরে ধীরে ভয় কাটতে থাকল তার। তমাল সেন খুব ভদ্রলোক। এবং কেজো লোক। কাজের বাইরে অন্য কোন আলোচনা হয় না তাদের মধ্যে। ঝড়ের গতিতে কাজ করতে ভালবাসেন ভদ্রলোক।

গতকয়েকদিন আগে একটু চাপে পড়ে গেছিল সায়নী। বেশ কয়েকজন ভি আই পি এসেছিলেন মিটিং করতে। তাকেও থাকতে হয়েছিল। অনেককেই টিভিতে দেখেছে সে। চেনেও। বাড়ি ফিরতে অনেক দেরী হয়েছিল সেদিন। প্রায় রাত একটায় স্যার নিজে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছিলেন।

নিজের থেকে প্রায় পচিশ তিরিশ বছর বড় হওয়া সত্ত্বেও সায়নী বেশ বুঝতে পারে তার মনে তমাল সেনের ব্যাপারে একটা সফট কর্নার তৈরি হচ্ছে। আহেলিদি সেদিন বলছিল ভদ্রলোক বিবাহিত জীবনে অসুখী। সে খবরটা তাকে যেন একটু খুশি করে দিল।

তার মা বিনতা কিছু একটা আন্দাজ করে বলেই আজকাল তাকে একটু বেশিই জ্বালাতন করছে বিয়ের জন্য। বিনতা দেখেছে তমাল স্যারের নাম বলতেই মেয়ের মুখে একটা অন্য ধরনের জ্যোতি দেখা দেয়। এ ব্যাপারটা তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে আজকাল।

চোখের কোণেও ইদানীং কালি পড়ছে। রাতে মেয়েটার ঠিক ঠাক ঘুমও হচ্ছে না। পাড়ার লোকেরাও ঠারে ঠোরে উল্টো পাল্টা বকে ভালই বুঝতে পারেন তিনি। তবে টিভিতে যখন দেখেন এদের এক একটা ক্যুইজে লাখ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে, এবং প্রবল জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এদের অনুষ্ঠানগুলি, আজ এখানে কাল ওখানে অফিস, জমি কত কিছু বিক্রি হয়, তখন কিছুটা আশ্বস্ত হন।

শুধু মেয়ে যখন তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে "মা চিন্তা কোর না তো এত, কত্ত লোক চাকরি করছে কত মেয়ে আমাদের অফিসে আর তুমিই শুধু চিন্তা করেন"।

তখন তিনি সেই অতি পরিচিত কথাটিই মেয়েকে বলেন "মায়ের মন তো রে মা, ভাল হলেই ভাল"।

১২।

তরুণ বাড়ির ছাদে চিন্তিত ভাবে হাটাচলা করছে। একটা বাজে খবর এসছে। সুকান্ত নাকি খোকনকে নামিয়ে দিয়েছে। পালদের পুকুরে লাশটা দেখতে ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে গেছে। ইদানীং বেশ কিছু ছেলেকে টাকা দিয়ে পুষছে সুকান্ত। এ তাদেরই কাজ পাকা খবর পেয়েছে তরুণ।

গত কয়েকদিন ধরে সুকান্তর সাথে সেরকম ভাবে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু এই খবরটা তাকে ধাক্কা দিয়েছে। যে ছেলেটাকে সে সুরজিত শিকদারের আস্তাকুড়ে থেকে তুলে এনে এত বড় করল সে আজ তাকে না জিজ্ঞেস করে এ কি কান্ড করে বসল?

ফোনটা একবার বাজতেই তুলল সুকান্ত "বল তরুণদা"।

-ফোনে বেশি কিছু বলব না, তুই কি এখানেই আছিস? আসতে পারবি একবার?

-সিওর, পাড়াতেই আছি দশমিনিটের মধ্যে আসছি।

খবরটা কদিন ধরে আসছিল। সুকান্ত নাকি একটা গ্যাং তৈরি করছে। সেভাবে আমল দেয়নি তরুণ, কিন্তু এত বড় একটা অপারেশান হয়ে গেল অথচ সে জানতে পারল না এ কেমন কথা?

বড় টয়োটা গাড়িটা এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। ছেলেটা যখন এসেছিল তার কাছে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারত না। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ঘরের মধ্যে। চুপ চাপ থাকত। কথা কম বলত।

এখন হাতে দুটো মোবাইল।গলায় মোটা একটা সোনার চেন। ছাদ থেকে সেটাই দেখছিল তরুণ।

সুকান্ত সোজা ছাদে চলে এল। ওকে নিয়ে চিলেকোঠার ঘরে ঢুকল তরুণ। একটা চেয়ারে ওকে বসতে বলে দাঁড়িয়ে বলল “হ্যাঁরে, খোকনকে যে টপকে দিলি, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারতিস তো?”

সুকান্তর চোখটা একবার জ্বলে উঠে পরক্ষণে নিভে গেল। বলল “তরুণদা, ঝিমলির বিয়ের দিন আমি যখন মদের ঘোরে খোকনকে বলেছিলাম আমি ঝিমলিকে ভালবাসি সেদিন আমার মাথায় খোকন পিস্তল ঠেকিয়ে বলেছিল ‘খানকির ছেলে এর পরে যেন এই কথাটা কেউ জানতে না পারে, জানলে পুতে দেব একেবারে’। আর সেটা আমি ভুলে যাব বলছ?”

তরুণ বিরক্ত হলেন “এই সেদিন বিয়ে করলি, কোথায় এখন বউকে নিয়ে হানিমুনে যাবি তা না। কবে ঝিমলিকে নিয়ে কি বলেছে সেটা তোকে মনে রাখতে হবে?কেন বউকে ভালবাসিস না?”

সুকান্ত উঠে দাঁড়াল, বলল “অতীতে যে যে কাঠি করেছে, কোন শুয়োরের বাচ্চাকে ছাড়ব না। এবার সুরজিত শিকদারের পালা”।

বিচলিত হল তরুণ। এ ছেলে রাজনীতি বোঝে না। নিজের রাগ দিয়ে দুনিয়া শাসন করতে নেমেছে। সুরজিত শিকদার যে গোপনে তার সাথে যোগাযোগ রাখছে সে খবর জানলেও তো সুকান্ত ক্ষেপে যেতে পারে। সে সুকান্তকে জোর করে চেয়ারে বসাল।

“শোন রাজনীতিটা বুঝতে হবে। সামনে লোকসভা ভোট। সুরজিতকে পার্টি থেকে এক্সপেল করেছে। এখন এটার ফায়দাটা তো তুলতে হবে। এটা বুঝছিস না কেন?”

সুকান্ত গুম হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষন। ওর মত ছেলে হাত থেকে বেরিয়ে গেলে মুস্কিল আছে। এমন কিছু করতে হবে যাতে সাপ মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে।

তরুণ হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করল “কাকে তুলেছিস টিমে? কালুকে?”

সুকান্ত মাথা নাড়ল।ওর কাঁধ চাপড়ে দিল তরুণ।

“শোন বড় কোন ডিসিশান নিতে হলে অ্যাটলিস্ট আমাকে জানিয়ে করিস। বাকি ঝামেলাগুলো তো আমাকেই সামলাতে হবে রে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যবসাটা ভাল করে সামলা। কালেকশানগুলি কর। মোল্লাপাড়ায় রহমান গ্রুপ ঢুকিয়েছিস?”

হ্যাঁ বলল সুকান্ত।

তরুণ বলল “এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি লাগবে ভবতারিণীর। রিয়েল এস্টেট হবে। সরকার থেকে কেনা যাবে না। খুব গোপনে সারতে হবে।জোগাড় হবে?”

মাথা নাড়ল সুকান্ত। তরুণ প্রাণপণে সুকান্তর মনটা অন্যদিকে নেবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। অনেকগুলি কাজের কথা বলে প্রায় আধঘণ্টা বাদে বুঝল ছেলেটা থিতিয়েছে কিছুটা।

সে অফার করল “বিয়ার খাবি? চিল্ড বিয়ার আছে”।

তখনই সুকান্ত হঠাৎ বিনা মেঘে ভেঙে পড়ল “তরুণদা আমার বউ আমাকে ছুঁতে দেয় না। ও না কি কাকে ভালবাসে। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না, কাল মাঝরাতে ডিশিসান টা নিলাম। মনে হচ্ছিল ঝিমলি আর সুরজিত আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। কালুদের ডেকে খোকনের ডেরায় গিয়ে নিজের হাতে মেরেছি শুয়োরটাকে”।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তরুণ। কেসটা যে এভাবে বাঁক নেবে কস্মিনকালেও বুঝতে পারে নি সে।

13.

কুকুর পাগল হয়ে গেলে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। আর সুকান্ত পাগলের থেকে বেশি কিছুই হয়েছে। তরুণ বুঝতে পারছিল না ওকে সামলানো যাবে কি করে। কোনমতে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে ওকে।

ওর বউ ওকে ধরতে দেবে না সেটা ও কি করে বুঝবে? কথাটা মনে আসতে কিছুটা নড়ে চড়ে বসল তরুণ। পরশুদিন সুকান্তর শ্বশুড়বাড়ির অঞ্চল থেকে বিষ্ণু কর্মকার বলে একজন পার্টি কর্মী খুন হয়েছে। এই লোকের সাথে সুকান্তর কোন সম্পর্ক নেই তো?

বেশ খানিকটা অস্বস্তি হচ্ছিল তার। এ ছেলেটা কি শেষে মানসিক রোগী হয়ে গেল নাকি! তাহলে তো সুকান্ত বেঁচে থাকলে সব দিক দিয়ে ক্ষতি!

সমস্যাটা হল ছেলেটার উপর মায়াও পড়ে গেছে তার। ভোটের সময় অমানুষিক খাটে,যে কোন ঝামেলায় বুক চিতিয়ে এগিয়ে যায়, তাছাড়া ভবতারিণীর খুব প্রথম সারির এজেন্ট, সুকান্তর কিছু হলে তার বড় একটা প্রভাব তার উপর এসে পড়তে বাধ্য।

বেশ কিছুদিন ধরেই একটা গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, খুচরো খাচরা খবর আসছে। তার ওপর যদি সুকান্ত ক্ষেপে যায় তবে চিন্তাটা বাড়বে বই কমবে না।

ফোনটা হাতে নাড়া চাড়া করতে করতে শেষ মেষ ফোনটা করেই বসল সে।

প্রথমে ধরল একজন মেয়ে।

সে বলল “শঙ্করদাকে দেওয়া যাবে? আমি তরুণ বলছি”।

পাঁচমিনিট পরে ফোন ধরল শঙ্কর “বল কি সমস্যা?”

-আরে সুকান্ত তো পাগল হয়ে গেছে। খোকনকে নামিয়ে দিল।

-তাতে কি? ভালই হয়েছে। আমি তো চেয়েছিলাম। গলাটা নিশ্চিন্ত লাগছিল শঙ্করের।

"আরে দাদা সমস্যাটা অন্য, সুকান্ত একটা গ্যাং করেছে, যা ইচ্ছা তাই করছে ওদের নিয়ে। এখন কিছু না করলে সমস্যা বাড়বে"।

-ব্যস্ত হোয়ো না। যদি বুঝি সময় এসেছে, আমি ঠিক বলে দেব। খালাস করা নিয়ে চিন্তা কোর না। তার আগে বল তোমাকে ভবতারিণীর জন্য জমি দেখতে বলেছিলাম দেখেছ?

-হ্যাঁ দাদা। আমি সুকান্তকে কালকে বলেছি। এখন দেখা যাক, এদিকটা ও মন দেয় নাকি।

-ও যদি না দেয়, অন্য কাউকে লাগাও, প্রয়োজনে বাজারদরের দ্বিগুণ টাকা দাও। এ সুযোগ ছেড়ে দিও না।

-আচ্ছা।

-আর সুকান্তর ব্যাপারে খোঁজটা রাখ। তার বেশি কিছু করতে যেও না। মনে রেখো, ও ভবতারিণীরও এজেন্ট। প্রয়োজনটা কিন্তু ভাইস ভারসা।

কেটে দিল শঙ্কর ঘোড়ুই। চিন্তা কম লাগছিল তরুণের। উপর মহলে জানিয়ে দিয়েছে যখন যাক।এরপর ইন্সট্রাকশান আসলে মুভ করা যাবে।

চিন্তা করতে করতে নড়ে চড়ে বসল তরুণ। সুকান্তকে কোন কাজে ইনভলভ করে দিতে হবে। ওকে আগে জমিটার ব্যাপারে বলা হয়েছিল। জমির জন্য সবাই হা পিত্যেশ করে থাকে, বাপ পিতেমোর জমি সবাই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় এসব হচ্ছে ফালতু কথা। আদতে সবাই টাকার গোলাম।

ঠিক ঠাক দাম দিলে, আর বেশি লোককে না জানালে সব বিক্রি করা যায়। লোকে জেনে গেলেই বিপদ। একবার

জেনে গেলেই দেখা যায় কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও থেকে কাঠি করতে চলে যাবে।

আসলে এখানকার লোক ভাল কাজ চায় না। শিল্প চায় না। চাকরি চায় না। আর কারও ভাল দেখতে চায় না। এরা যেটা ভাল পারে সেটা হল কাঠি করা। কাঠি করায় বাঙালির থেকে ভাল কেউ নেই।

আপাতত সুকান্তকে দিয়ে তিরিশ বিঘা ভবতারিণীর জন্য জোগাড় করা যাক। পরে আবার না হয় বসে ঠিক করা যাবে কি কি করা যায়।

ফোনটা আরেকবার ধরল সে। এবার সুরজিত শিকদার।

-দাদা।

-আরে তরুণ যে। কি খবর?

-আপনি কি ভুলে গেলেন দাদা? আমি বরং চিন্তা করছি আপনি তো পার্টি থেকে এক্সপেল হয়েই গেছেন।এবার আমাদের দলে চলে আসুন।

-কি যে বল। এতদিন একটা আদর্শ নিয়ে লড়াই করলাম, এখন জার্সি বদল করে দিতে বলছ?

-সেতো দাদা তোমার পার্টি সম্মান দিল না। উল্টে বার করে দিল।

-সে ভাল করেছে যা করেছে, আমি আর চিন্তা করিনা, যা হবে দেখা যাবে। লোকসভার ক্যান্ডিডেট ঠিক হল?

-না দাদা, আগামী হপ্তায় বসবে। তবে আপনি আমাদের জয়েন করলে কিন্তু দাদা আমার বলটা বেশি হল।

-হা হা। সেসব চিন্তা কোর না। ভোট হোক। দরকার হলে তুমি নির্দলে দাঁড়িও।

-সেটা হাইকম্যান্ডের অর্ডার এলে তাই করতে হবে দাদা।

-হুম। ঠিক আছে। রাখছি এখন।

ফোনটা রাখার সময় তরুণের সামান্য অস্বস্তি বোধ হলে কি মনে করে পেছনের দিকে তাকাল। দেখতে পেল সুকান্ত দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার।

১৪ ।

ইদানীং কালুর মুখে খুব থুতু আসছে। কোত্থেকে আসছে বুঝতে পারছে না সে। ডাক্তার দেখানোর কথা ভাবছে। আজকাল সুকাদা এত কাজ দিচ্ছে যে অন্য কিছু করার কথা চিন্তা করতে পারছে না সে।

গত পরশুর মার্ডারটা করার পর থেকেই মনে হয় এমন হচ্ছে। কলকাতা গিয়ে লাশটা নামিয়ে আসতে হয়েছে। মালটা পার্টি অফিস থেকে বেরচ্ছিল।রাত ন'টা বাজে তখন। প্রথমে গাড়িতে সুকাদার নাম করে তুলে ধাপার মাঠের কাছে নিয়ে পেচ্ছাপ করতে নেমে চুপচাপ ঘোড়াটা টেনে দিতেই কাজ শেষ। বিষ্টু কর্মকার ফিনিশ। লাশটা নালায় ফেলে দিয়ে চুপচাপ কেটে পড়ল।

মরার আগে অব্দি ব্যাটা বুঝতে পারেনি ওকে মারা হবে। কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। ভাবতেই হাসি পাচ্ছিল কালুর। প্রথম প্রথম নামালে ঘুম আসত না। সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখত।

এখন মাল খালাস করে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। সুকাদার এই নতুন কেনা ফ্ল্যাটটায় আপাতত আছে সে। লোকজন কম থাকে চারিদিকে। এলে খারাপ লাগে না। নিজেকে বাদশা মনে হয়।

সুকাদা আজকাল অনেক টাকা দিচ্ছে। আগের দিন ফিরে খুশ খবরটা শোনাতে দুলাখ ক্যাশ সাথে সাথে বের করে দিত। সেদিন টাকা নিয়েই রেশমির কাছে গেছিল কালু। সারারাত গরম মেয়েছেলেটা তাকে খুব আরাম দিয়েছে।

আগে ভয় পেত সে। এখন জানে মাথার ওপর ছাদের মত মাথার ওপর শেল্টার থাকলে কোন শুয়োরের বাচ্চার কিছু করার উপায় নেই। তাই সে বিন্দাস আছে।

সুকাদার প্রচুর চেনাশোনা। এলাকায় সবাই এক ডাকে চেনে। চাপ তো একেবারেই নেই তার। তবে সুকাদাকে সে একটু ভয় পেয়েছে আগের দিন। তাকে নিয়ে যখন খোকনকে মারতে গেল, তখন ওর চোখদুটো মনে হচ্ছিল আগুনের গোলা। ছ'টা বুলেটের সব কটাই ভরে দিল ওর বুকে। কি রাগ রে বাপ।

এরকম রাগ কেন পুষে রেখেছিল কে জানে! সে কিন্তু কোনদিন কাউকে রেগে মারে না। তার স্টাইল হল মাথা ঠাণ্ডা রেখে অপারেশান শেষ করা।

বিষ্টু গাড়িতে ওঠার পরে প্রথমে জিজ্ঞেস করল "কি খবর ভাই? সুকান্ত বাবু হঠাৎ ডেকে পাঠালেন?"

সে কলকাতায় ঢোকার আগে একটা দামী মাল খেয়েছিল। একটা নিবের পুরোটাই। তারপরে একটা মিঠে পাতি পান। মিষ্টি মিষ্টি বিদেশী মদের পরে পান খেতে দারুণ লাগে। আগে বিদেশী পেত না। আজকাল বাংলার নাম শুনলেই তার বমি চলে আসে।

মিঠে পাতি পানের পিক ফেলতে ফেলতে সে নির্বিকার ভাবে বলেছিল "জানি না ভাই, কি বিজনিস আছে। আমাকে পাঠাল শুধু। পান খাবে?"

তা পান খেয়েছিল বিষ্টু। খেতে খেতে কত গল্প। সুকাদার বিয়ের পরে দে বাড়ির লোকজনের পাড়ায় কদর বেড়ে গেছে, কত লোক আসে চাকরির জন্য। কত্ত কথা। তার বাপও নাকি বলেছে দে বাড়িতে গিয়ে হত্যে দিতে।

তার বাপ জানে না, দে বাড়ির জামাই, মানে আসল লোকের সাথেই তার দহরম মহরম।

বিষ্টুর বকবকানিতে অধৈর্য হয়ে গাড়িতে জোরে মিউজিক চালিয়ে দিয়েছিল। তাতে বিষ্টুর কি মাথা নাড়া। শালা কত যেন গান বোঝে।

ধাপার মাঠ অবধি গাড়ি পৌছলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল সে। মালটার ভাট বকা আর শুনতে হবে না।

ড্রাইভার বলাইকে গাড়ি সাইড করে দাঁড়াতে বলে বিষ্টুকে বলল "পিসাব হবে?"

বিষ্টু না নামলে অপারেশানটা গাড়িতেই সারতে হত। বলাইয়ের তাতে আপত্তি ছিল। তা ঝামেলা আর হল না। বিষ্টু

প্যান্টের চেন খোলার সাথে সাথেই সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে কাম খতম করতে চোখের পলকও পড়ল না কালুর। এরকম কাজে মস্তি আছে।

হামলায় গিয়ে গুলি গালাজ আজকাল ভাল লাগে না কালুর। বয়স বাড়ছে। ছেলেটার প্রায় আঠারো বছর বয়েস হয়ে গেছে। লাইনে অটো চালায়। বউটা আজকাল বাড়ি না থাকলে ভীষণ খিটখিট করে।

কিন্তু বিছানায় আজকাল মজা নেই একেবারেই। অপারেশনটার বাদে তাই রেশমি ছাড়া ভাবতেই পারে নি সে।

শুধু রেশমির সাথে মৌজ করার সময় একবার সুকাদার চোখের কথা ভেবে বুকটা কেঁপে উঠেছিল এলাকার ত্রাস কালু মাস্তানের। বিষ্টুর খবরটা শুনে শুধু বলেছিল "কাজ ঠিক করে না হলে এটাই করব এখন থেকে"।

সে এত লোকের সাথে কাজ করেছে। কিন্তু এরকম চোখের লোকের সাথে কোনদিন কাজ করে নি।

থুতুটা কি ভয়ে আসছে আজকাল? বুঝতে পারছেনা কালু।

১৫।

টাকার ঘরে বসেছিল সুকান্ত। এই ঘরে থাকার আলাদা একটা আনন্দ আছে। যখন টাকা ছিল না, টিউশনি করে দেড়শো টাকা প্রথম রোজগার ছিল সুকান্তর। তা জমিয়ে ঝিমলির জন্য একটা পার্কার পেন কিনেছিল। ঝিমলি নেয় নি।বলেছিল "আপনার কষ্টের টাকায় কেনা আপনার কাছে থাক। পড়ানোর সময় ব্যবহার করবেন না হয়"।

এখনও লাল কালো রঙের পেনটা তার ঘরে রাখা আছে। বাড়িটা রেনোভেট করার পর নিজের জন্য একটা স্টাডি রুম করেছে সে। ওখানেই এখন টাকা থাকে। একবার কালেকশনের চল্লিশ কোটি টাকা রাখা ছিল তার ঘরে। সারারাত টাকা বিছানার মত করে রেখে তার ওপর শুয়ে ছিল সে।

তার বউ নন্দিতা ফুলসজ্জার দিন তাকে বলে দিয়েছিল সে তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। বিয়ের আগে একজনের সাথে তার নাকি সম্পর্ক ছিল। ছেলেটা তাকে কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে। কিন্তু করে নি। শারীরিক মানসিক সব রকম সম্পর্ক ছিল তার সাথে।

বিয়ে করতে রাজি ছিল না সে। বাবা মার মুখ চেয়েই করে। কিন্তু তারপর ফুলসজ্জায় এসে হঠাৎ তার এই

উপলব্ধি। সুকান্ত চাইলে সে ডিভোর্স দিয়ে দেবে।

এখনও ঠিক করে ওঠে নি সে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে অনেকটা বদলে গেছে সুকান্ত। ঝিমলি তাকে ভালবেসেছিল না বাসেনি তা সে জানে না। কিন্তু নন্দিতার ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল তার কাছে।

হঠাৎ করে মাথায় অমানুষিক রাগ চাপে। কাউকে সামনে পেলে খুন করে দিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে সব কিছু দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলে দিতে। কেন এমন হয় তা সে জানে না।

টাকা গুলি সামনে সাজানো থাকলে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি আসে। তমাল সেন একদিন ফোন করে বললেন তার জোনের সব কালেকশন কলকাতা পাঠানোর দরকার নেই। তার বাড়িতেই রাখতে।

তারপর থেকেই কালুদের রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কিন্তু নন্দিতার কথা শোনার পরে কি যে মাথায় চাপল। মাঝরাতে গিয়ে নিজের হাতে মারল খোকনকে। বিষ্ণুর ওপরেও প্রচন্ড রাগ হচ্ছিল। শেষমেষ কালুকে বলল ওকে উড়িয়ে দিতে।

টাকার ঘরটায় এলে দয়া মায়া গুলি গান্ধীজীর নোটের সামনে পড়লে কোথায় যেন পালিয়ে যায় না বলে। একমাত্র এই ঘরে এলেই সে ঝিমলি নন্দিতা সব ভুলে যায়। মনে হয় পৃথিবীর মালিক সে।

টাকা আজকাল যায় যত আসে তার দ্বিগুণ। যারা রেকারিং করছে তারাই সে টাকা ম্যাচিওর হয়ে গেলে ফিক্সড ডিপোজিটে দিয়ে দিচ্ছে। ব্যাঙ্কের থেকে দ্বিগুণ কখনও তিনগুণ টাকার লোভে সবাই টাকা রাখছে।তার নিজের সব টাকাও ভবতারিণীর অ্যাকাউন্টেই আছে।

রাতগুলি আজকাল অসহ্য কাটে তার। ঘরের আবহাওয়া হিম শীতল করেও ঘুম আসতে চায় না। সারারাত উঠে বসে থাকে। নন্দিতা ঘর বন্ধ করে ঘুমোয়। তাকে ঢুকতে দেয় না। মা দাদার ঘরে থাকে বলে কেউ জানতে পারে না।শুধু সুকান্ত পোড়ে একা একা।

তরুণদা বার বার বারণ না করলে সে হয়ত এতদিনে সুরজিতকে উড়িয়ে দিতে পারত। তবে সে ঠিক করে নিয়েছে কালুকে দেবে না। যেদিন ওড়াবে নিজের হাতে ওড়াবে। লোকসভা ভোট অবধি অপেক্ষা। তারপরে কারও কথা শুনবে না ।

প্রথম প্রথম যখন ঝিমলিকে নিয়ে যেত পড়ার বা অন্য কোন সময় সুরজিত কিছু বলত না। একদিন হঠাৎ তাকে

ডেকে পাঠিয়েছিল। বসার ঘরে তখন কেউ ছিল না।

সে গিয়ে বসলে মোলায়েম স্বরে বলেছিল "ঝিমলির ওপরে অনেকেরই আকর্ষণ আছে বুঝলি। আমি তো বাপ। আমি বুঝতে পারি। অনেক কুত্তার বাচ্চারা ঘুর ঘুর করে। তা সেরকম বুঝলে আমি কুত্তার মতই গুলি করে মারব তাদের"।

সুকান্ত বুঝেছিল পরোক্ষে তাকেই থ্রেট দিয়েছিল সেদিন সুরজিত। নন্দিতা যখন বলছিল "আমি বিয়ে করেছি একরকম জোর করে। মা বাবার জন্যে। আপনার সাথে আমি থাকতে পারি, কিন্তু আর কিছু করতে পারব না। শারীরিক আর মানসিক কোনভাবেই আমি আপনার বউ হতে পারব না"; মনে হচ্ছিল সুরজিত শিকদারের লেখা স্ক্রিপ্ট গড়গড় করে বলে যাচ্ছে নন্দিতা। পুতুল সে, নাচাচ্ছে সুরজিত।

তার পর থেকেই রাগটা আজকাল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যখন তখন। তখন আর নিজেকে সামলাতে পারছে না সে।

ফোন বাজছে। আধো ঘুম অবস্থায় রিংয়ের শব্দে চোখ খুলে দেখল ফোনের স্ক্রিনে নামটা ভেসে উঠছে। তমাল সেন।

ফোনটা রিসিভ করতে ওপাশ থেকে কেজো গলাটা শোনা গেল, "সুকান্ত, কালেকশনের সব টাকা পরশু কলকাতা অফিসে পাঠিয়ে দাও, এদিকের ঝামেলা মিটেছে প্রায়"। সে সম্মতি জানাতে কেটে দিল ফোনটা।

তারমানে টাকা আবার তার কাছে থাকবে না। এত পরিশ্রম করে তোলা টাকা তার থাকবে না। কালুদেরও তবে রাখার দরকার নেই?

মাথার ভেতর রাগটা ঘূর্ণিঝড়ের মত যাচ্ছিল আসছিল।

16.

সকাল থেকে ইন্সপেক্টর দাশের মন মেজাজ ভাল নেই। একে পাঠকপাড়ায় এখন নিত্যদিন খুন জখম দলাদলি লেগে আছে তার ওপর উপর মহল থেকে ফোনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। একই দলের এক নেতা ফোন করে কোন ক্রিমিনালকে ধরতে বলছে তো কিছুক্ষন বাদে সে দলেরই আরেকনেতা বলছে তাকে ছেড়ে দিতে।

তার হয়েছে এখন “ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি” অবস্থা। মাছের মুড়ো দিয়ে রাতের খাবারটা খেয়ে যখন ভাল করে জাঁকিয়ে ঘুমটা এসেছিল তখনই খবর এল খোকন খরচা হয়ে গেছে।

খোকনের ওপর নজর রাখার কথা ছিল তার। ওর সিকিউরিটির জন্য বলেছিলেন তরুণবাবু। কালুর গ্রুপ ওকে উড়িয়ে দেওয়ায় একদিকে শঙ্কর ঘোড়ুই ফোন করে কেসটা চেপে যেতে বললেন অন্যদিক তরুণ হাজরা ধমকি দিয়ে দিল সেদিন।

“একটা কাজও ভাল করে করতে পারেন না। সব হয়ে যাবার পরে আমাকে জানতে হল”।

এমনিতেই এরা এখন হাতে মাথা কাটছে। কখন যে কোত্থেকে কে এসে আওয়াজ দিয়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে একটা রেপ কেস এসছিল। প্রথমে ফোন করে বলল কেসটা হালকা করে দিতে। তারপরে যে বলল সেই থানা ঘেরাও করে সে কি বিরাট বক্তৃতা।

দাশের মনে হচ্ছিল এই চাকরি করার থেকে এখন গেরুয়া পড়ে বনবাসে গেলে বেশি ভাল হত। বেশি ট্যা ফো করলেই সুন্দরবন ট্রান্সফার। তখন দৌড়ে বেড়াও। তবে আজকাল মনে হচ্ছে পাঠকপাড়ায় চাকরি করার থেকে সুন্দরবন ট্রান্সফারটাই ভাল অপশন ছিল। এখানের বাঘ সিংগির থেকে বনের বাঘ সিঙ্গি ঢের ভাল।

সকাল থেকে থানায় এসে বসে রয়েছে খোকনের পাগলী মা। চুল উসকো খুসকো। বুড়িকে অনেকবার তাড়াতে চেষ্টা করেছেন, দুয়েকবার কনস্টেবল দিয়ে লাঠির খোঁচাও মারা হয়েছে। কিন্তু যাবার কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই ডুকরে কেঁদে উঠছে “ওরে আমার খোকা রে, কে মারল তোরে”।

নিজের চেম্বারে নিশ্চিন্তে বসতে পারছেন না দাশ। কি যে যন্ত্রণা শুরু করল বুড়িটা। ছেলে মানুষ করার সময় খেয়াল ছিল না, এখন এসেছে সকালটা নষ্ট করতে।

ফোন বাজছে। নাম্বারটা দেখে আবার মেজাজ খারাপ হল। তরুণ। সকাল সকাল আবার কি জ্বালাবে কে জানে।

মধুর স্বরে ফোনটা রিসিভ করলেন দাশ

“বলুন স্যার”।

“বলছি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন নাকি আজকাল। কাজ ফাজ কবে করবেন? সরকারি অন্ন ধ্বংস ছাড়া কিছু শিখেছেন?”

মেজাজ খিচড়ে গেল। শালা! ভোটে জিতে নিজেকে মস্ত বড় হনু মনে করছে। কথা বলছে কি ভাবে!

কিন্তু জাত সাপ। গলা সেরকম মধুর করেই বললেন তিনি

“ কেন স্যার কি হয়েছে?”

“কি হয়েছে মানে? খোকন মার্ডার হল। কালুর এগেন্সটে কিছু করেছেন?”

এই হল কেস। কালুর নামে এফ আই করবেন তারপর আবার শঙ্কর ঘোড়ুইয়ের ইয়ে খেতে হবে।

“মানে স্যার এখনও তো কিছু প্রুভ হয়নি। তাছাড়া শঙ্করবাবু তো চেপে দিতে বলছেন”।

শঙ্করের টোপটা ইচ্ছে করেই হাওয়ায় ভাসালেন দাশ।

“বলেছে? আমি কথা বলছি। যদি না বলে থাকে তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন”।ফোনটা কেটে দিল তরুণ।

বাপ রে। আপনি থেকে একেবারে তুই। অথচ ভোটের আগে এই মালটাই কি মধুর ব্যবহার করত। প্রথম যখন এসছিলেন ভোটের তিনমাস আগে, এসে দেখা করে গিয়েছিল। সে কি ভাল ব্যবহার।

আর এখন কি! সুকান্ত ওর চামচা। কালু সুকান্তর মাস্তান। শঙ্কর বলছে কালুকে বাঁচাতে। আবার তরুণ চাইছে

কালুকে ধরতে।

আবার ফোন। বাহ। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। শঙ্কর।

আবার মধুর গলা করতে হল

“গুড মর্নিং স্যার”।

“মর্নিং। তরুণ আমাকে ফোন করেছিল এখন। আপনি ওকে বলেছেন আমি কালুকে ধরতে বারণ করেছেন?”

এই রে। এবার গলা শুকিয়ে আসছে।

“না মানে স্যার আমি বলেছি কেসটা আপনি টেক আপ করবেন বলেছেন”।

“হুম। ঠিক আছে। আমার যেটা মনে হচ্ছে পাঠকপাড়ায় আপনি একটা ইউজলেস। আপনি আমার কন্সটিটুয়েন্সিতে চলে আসুন। তরুণকে সামলাতে বুদ্ধিমান লোক দরকার। আপনার মত বুদ্ধু না”।

নাও, এবার এও শুরু হল। সেফ খেলাই ভাল।

“আপনি যা বলবেন স্যার”।

“গুড। ইউসলেস একটা”।

ফোনটা কেটে দিল শঙ্কর।

বুড়ির চিৎকার আর এই গোলকধাঁধার মধ্যে ইন্সপেক্টর দাশ পাজলড হয়ে বসে রইলেন।

১৭।

সরকারি ব্যাঙ্কের লোকগুলির ব্যবহার দেখে মাথা গরম হয়ে যায়। নিজেদের কুকুর ছাগল বলে মনে হয়। তার ওপর আদ্দিকালের অফিস। সুদ কম।

বিল্টু বাবার সাথে বাবার ফিক্সড ডিপোজিটের তুলতে এসেছিল। মেঘ করে আছে সকাল থেকেই। যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে। এতগুলো টাকা বলে বাবাকে একা পাঠায় নি। সেও এসেছিল। বাবার টাকাগুলি নিয়ে তাড়াতাড়ি ভবতারিণীর অফিসে দিয়ে এলে বাঁচা যায়।

কালকে পলাশ এসেছিল বাড়িতে। বলল ১০লাখ টাকার এম আই এস করলে মাসে পনেরো হাজার পাওয়া যাবে। এখন ব্যাঙ্ক দেয় আটের কাছাকাছি। এত বেশি পাওয়া গেলে কেন আর সরকারি জায়গায় রাখা যাবে। তাছাড়া বেকার বসে আছে এখনও সে। চাকরি না পাওয়া অবধি বাবার টাকাতেই সংসার চালাতে হচ্ছে। টাকা একটু বেশি বাড়লে তো ভালই হয়।

পলাশ তাকে একটা এজেন্সি নিতে বলছে। ভবতারিণীর। প্রতি ফিক্সড ডিপোজিটে টুয়েন্টি পারসেন্ট কমিশন। রেকারিংয়ে টেন। খারাপ হয় না ব্যাপারটা। পরের গোলামি করার থেকে এটা করা অনেক ভাল। তাছাড়া এদেরটার সাথে সরাসরি অনেক সরকারি লোকই জড়িত।টিভি চ্যানেল, খবরের কাগজ, রিয়েল এস্টেট, ফিল্মসিটি, ফিশারি কি নেই।

পলাশ তো এও বলল ভাল ভাবে ডিপোজিট জোগাড় করলে সুকান্তকে বলে পাশের এলাকায় জি টি রোডের ওপরে যে ফ্ল্যাটগুলি হচ্ছে সেখানে কম দামে একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

কাল সারারাত ভেবে ব্যাঙ্ক খুলতেই বাবাকে নিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে এসছে সে।বাবার ডিপোজিটের কমিশন দিয়েই না হয় চাকরিটা শুরু করা যাক।

ব্যাঙ্কের বড়াল বাবু চোখ নাক কুঁচকে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

“সব টাকা তুলে ফেলবেন?”

মাথা নাড়ল সে।

"হ্যাঁ"। বলল বাবা।

"কেন?"

বাবাকে শিখিয়ে পড়িয়েই নিয়ে এসেছিল সে। অসুখ বিসুখের কথা বললে টাকাটা তাড়াতাড়ি লিকুইড করা যাবে।

"পেস মেকার বসাতে হবে। গিন্নির শরীরটা খারাপ। ওরও চিকিৎসার জন্য..."

"অ। ঠিক আছে। কাল আসুন। করে দেব"।

এখন হিসাব করে দেখলে বাবার আছে চোদ্দ লাখ। তার টুয়েন্টি পারসেন্ট সে কমিশন পাবে। তাছাড়া এম আই এসের হিসেবে পরের মাস থেকে টাকাটা বাড়বেও অনেক। বাড়ি ফিরে কাগজ কলম নিয়ে হিসাব করতে বসে দেখল পরিচিত জনেদের মধ্যে এর মধ্যেই কম করে পনেরো জন হাতের কাছে আছে। রঞ্জন চাকরি করে বড়। ওকে রিকোয়েস্ট করলে ও একটা ফিক্সড করবে না হতেই পারে না। তাছাড়া আত্মীয় স্বজন তো আছেই।

আর যারা করবে না তারা সুদের হার শুনলে এমনিতেই সব সুর সুর করে চলে আসবে। ফ্ল্যাটটা হয়ে গেলে এই ভাড়ার বাড়ির ঝামেলাটাও থাকবে না। জলের সমস্যা, বাথরুমের সমস্যা সবই চলে যাবে।

মা একটু গাই গুই করছিল পলাশ চলে যাবার পর তবে সে সামলে নিয়েছে। ভাগ্যে তার কোন দাদা দিদি বা ভাই বোন নেই।

গত মাসে প্রাইমারি স্কুলের টিচারের পরীক্ষা সে দিতেই পারে নি। এত বাজে ভিড়, স্টেশনে যাও বা পৌঁছেছিল, শিয়ালদা যাবার বদলে দমদম জংশনেই নেমে যেতে হয়েছিল। ভেবেছিল বাস বা অটো কিছু একটা পাবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। কিছুই ছিল না। অগত্যা একটা সিনেমা দেখে বাড়ি চলে এসেছিল। ফিরে বলেছিল ভালই হয়েছে।

চাকরি বাকরির যা অবস্থা এখানে থেকে কিছু হবে না। আর বাইরে সে যেতে পারবে না। একবার মুম্বই গেছিল একটা চাকরিতে। প্রথমদিন কর্পোরেশানের পায়খানায় লম্বা লাইন দেখে সেদিনই রিজারভেশান ছাড়াই

জেনারেল কম্পার্টমেন্টে করে বাড়ি চলে এসেছিল।

এলাকায় থেকে ভাল করে খেয়ে পড়ে বেচে থাকতে হলে এখন মা ভবতারিণীই ভরসা। তাছাড়া চোখের সামনে সুকান্তর উদাহরণটাও আছে। সুকান্ত তাদের জুনিয়র ব্যাচের ছেলে। লাজুক ছেলে ছিল। সাত চড়ে রা কাড়ত না। সেই ছেলে এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। বিয়েতে পাঠকপাড়ার ষাট শতাংশ মানুষ নিমন্ত্রিত ছিল।

ও যদি জিরো থেকে হিরো হতে পারে বিল্টু কেন পারবে না?

18.

মুখটা গম্ভীর করে বসেছিল তরুণ। সামনে মা টা খুব কাঁদছে। সেও কায়দা করে একটু চোখের জল আনার চেষ্টা করছে। এসব কেসে চোখের জলটা না আনলে লাভ হয় না। ভোটের জন্য দরকার হলে নিজের জীবনটাও বাজি রাখা যায় আর এতো সামান্য চোখে জল আনা।

মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরছিল। কালুদের গ্রুপ তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করে যৌনাঙ্গে পাথরকুচি ভরে খুন করে ফেলে রেখেছিল। কালুদের গ্রুপের ব্যাপারটা কনফার্ম না হলেও তরুণ নিশ্চিত এটা ওদেরই কাজ।

ঘরের ভেতর বসিয়েছে তাকে। তার পাশে একটা ফচকে মত সাংবাদিক। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছে একটা ঠাটিয়ে চড় দিতে, বহু কষ্টে সে ইচ্ছাটা দমন করতে হচ্ছে। ঢুকতেই প্রশ্ন করে বসেছে “এটা কার কাজ বলে আপনার মনে হয়?”

তরুণ যথাসম্ভব হাসি মুখে বলেছে “ভাই আমি তো অন্তর্যামী না, পুলিশও না। আমি কি করে বলব?”

-না শোনা যাচ্ছে আপনাদের দলের আশ্রিত সমাজবিরোধীরাই করেছে।

অতি কষ্টে রাগ দমন করে বলেছে “যদি তাই হয় তবে কঠোর সাজা দেবার দাবি জানাব”।

তারপরেও মেয়েটার মায়ের নানা কথার মাঝে ফুট কাটছে মাঝে মাঝেই। রাগটা বেড়ে যাচ্ছে। কালুরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুকান্তকে এবার একটু বারণ করা দরকার। সে নিশ্চিত সুকান্ত এই ব্যাপারটা জানলে কালুদের কপালে দুঃখ আছে।

বাড়িটার মধ্যে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। গোটা পাড়ার লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য ভয় নেই। এপাড়ায় তাদের দলের লোকই বেশি। তারাই মুরুব্বির মত ভিড় কন্ট্রোল করছে।

মেয়েটার দাদা বসে আছে। বেকার বোঝাই যাচ্ছে। তরুণ বুঝতে পারল ম্যানেজটা একে দিয়েই শুরু করতে হবে।

সে গলাখাকারি দিয়ে বলল “আসলে আমাদের সমাজটাই পচে গেছে। আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আগের শাসন এক্কেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। তুমি কি কর ভাই?”

ছেলেটা চমকে তাকাল। “কিছু না”।

চোখে একটু আশার আলো দেখা গেল কি ছেলেটার? তরুণ বুঝতে পারছিল ফুটো খুঁজে পাওয়া গেছে। এবার ঢুকে পড়লেই হল।

“তুমি কাল এসে আমার সাথে দেখা কোর। দেখি একটা ব্যবস্থা করা যায় নাকি। আর আমি ওপরমহলে কথা বলছি। দুলাখ টাকা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা…”

মেয়েটার মাটা হঠাৎ বলে উঠল “স্কুলে যাবার সময় বলছিল মা আজ শরীর খারাপ যাব না। দুদিন ধরে অসহ্য পেটে ব্যথা আর শরীর খারাপ। আমি জোর করে পাঠালাম। ভেবেছিলাম বন্ধুদের সাথে কথা বললে ভাল থাকবে।মেয়েটাকে ওই অবস্থাতেই…” ডুকরে কেঁদে উঠল।

তরুণের বিরক্ত লাগছিল। এসব কেসে আসা মানে একটা বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া।

সাংবাদিক ফিচকেটা হঠাৎ বলে বসল "আপনি কি মায়ের এই কান্নাটাকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে চাইছেন?"

তরুণ বাউন্সারটা ডাক করার চেষ্টা করল "মায়ের কান্না কেনার মত টাকা এখনও ছেপে উঠতে পারে নি হে। আমরা চেষ্টা করছি একটা দুস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে"।

"না এতো আপনার লোকই করছে, আবার আপনি এসে টাকা দিচ্ছেন, এটা একটা গট আপ হয়ে যাচ্ছে না?"

তরুণ ছেলেটার দিকে এবার রাগ চোখে তাকাল। বলল "কোথায় থাকা হয়?"

ছেলেটা বলল "এখানেই। কেন গুন্ডা দিয়ে মারবেন নাকি?"

তরুণ হাসল। বলল "পাঠকপাড়ার ছেলেরা এত অ-সংবেদনশীল হয়ে যাচ্ছে জানতাম না তো, একটা মেয়ে রেপড হয়েছে আর তুমি তামাশা শুরু করেছ? তোমার যা জিজ্ঞাস্য আমার বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস কোর। এখন এই পরিবারের পাশে থাকতে দাও আমার"।

ছেলেটা একটু নিভল এবারে। তরুণ মেয়েটার মা কে বলল "আপনি তো বিধবা? আপনি কাল ছেলের সাথে আমাদের পার্টি অফিসে একবার আসুন। আমি একটা বিধবা ভাতার চেষ্টা করব"।

মেয়েটার মাটা কেঁদে যাচ্ছিল তবু। ভিড় থেকে কে একটা চেঁচিয়ে উঠল "সব এই নেতাগুলোর গুন্ডাদের কাজ"।

তরুণ কড়া চোখে একবার ভিড়ের দিকে চাইল। ঠাণ্ডা হল কিছুটা। কে বলল দেখতে হবে। আজকাল বহুত বাড় বেড়েছে কিছু ছেলে।ঠিক টাইমে ব্যবস্থা না করলে এরা আরও বাড় বেড়ে যাবে।

মোবাইলে একটা ফোন এল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। চমকাল তরুণ। অনেকদিন বাদে ফোন "হ্যাঁ, বলুন"।

ওপাশ থেকে গম্ভীর গলা "এসব কি শুরু হচ্ছে পাঠকপাড়ায় তরুণ? কিছু দেখছ না নাকি?"

তরুণ ম্যানেজ করবার চেষ্টা করল "না মানে আমি এখানেই আছি তো। আমি দেখে নিচ্ছি। বলে দিয়েছি সরকার দুলাখ টাকা দেবে"।

"দুলাখ না। তিন লাখ বল। চাকরি বিধবা ভাতা যা পার দাও, কোন চ্যানেল দেখা যাচ্ছে না। বলছে পাঠকপাড়া এখন গুন্ডাদের স্বর্গরাজ্য হয়ে যাচ্ছে।পাঁচ মিনিটের মধ্যে শঙ্কর যাচ্ছে। ও চেক নিয়েই যাচ্ছে। আমাকে বলল। ইমিডিয়েটলি টাকাটা দেবার ব্যবস্থা কর। আর যা যা সমস্যা হচ্ছে শঙ্করকে বল"।

ফোনটা কেটে গেল। শালা। শঙ্করটা আজকাল খুব কাঠি করছে। কারণটা কিছুটা যেন বুঝতে পারছে তরুণ। কিছুদিন আগে শঙ্করের অপোজিট লবি সুবীরদার সাথে একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিল। সেটা শঙ্কর ভাল চোখে দেখছে না। কাঠিবাজি শুরু করে দিয়েছে।

আর এই এতক্ষণে দাশ ঢুকছে। অপদার্থ অফিসার একটা। গাড়ি থেকে নেমে তাকে দেখে কিছুটা ভয় খেল কি? ওকে একটা ধমক দিল তরুণ। পাবলিক এখন চারদিকে আছে। এই ধমকটা ভাল ইমপ্যাক্ট দেবে।

"কি করছেন কি আপনারা? জেগে ঘুমোচ্ছেন? কারা করছে এসব খুঁজুন। আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন এদের দেখতে পাই"।

দাশ কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

হুটারের শব্দ। শঙ্কর এসে গেছে।

পাড়ার লোকের চেঁচামেচির মধ্যেই ঘরে ঢুকল শঙ্কর। তাকে দেখে বলল "এই তো তুমি আছ, এই নাও এই চেকটা ওনাকে দিয়ে দাও"।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল "টাকা দিলে হবে? মেয়েটার কি হবে?"

শঙ্কর পাকা খেলুড়ে। ওদের দিকে হাত নেড়ে দাশের দিকে ফিরে বলল "আপনি প্লিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুনীদের খুঁজে বের করুন"। পাবলিক এবার শান্ত হল।

মেয়েটার মা মেঝেতে শুয়ে পড়েছিল।পার্টির ছেলেদের দিয়ে জোর করে তোলা হল। সবার সামনে চেকটা হাতে ধরানো হল। মা চেকটা নিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

পলাশ মেয়েটার দাদাটাকে পাশে ডেকে নিয়ে বলল “ভাই, চেকটা ভবতারিণীতে জমা করে দে, চারবছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে”।

ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে পলাশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

১৯।

জমিটা ঘেরা দেওয়া হয়েছে। বড় করে লেখা হয়েছে “ভবতারিণী রিয়াল এস্টেট”। সাথে একটা ভবিষ্যতে কেমন ফ্ল্যাট হবে তার ফটো। বিল্টু এখানেই পোস্টিং পেয়েছে। এলাকাটায় ইট ফেলা হয়েছে সবে। গত দুদিনের বৃষ্টিতে কাঁদা হয়ে আছে।

এজেন্সির সাথে যে মাসে বারো হাজার টাকার চাকরি জুটে যাবে এতটা আশা করে নি সে। পলাশ সুকান্তকে বলে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দুজন ছেলে থাকে রাত্রে। সে সকাল দশটায় আসে। কেউ সাইট দেখতে এলে তাদের নিয়ে বেরোয়। ফ্রিজের ব্যবস্থা, চায়ের ব্যবস্থা সবই করা আছে তার অফিসে। ভিজিটরদের চা কোল্ড ড্রিঙ্ক ইত্যাদি দেয়। এজেন্সি সাথে চাকরি সব মিলিয়ে খারাপ হয় নি ব্যাপারটা।

সকালে অফিসে ঢুকতে দেখল কালু বসে আছে। সে অবাক হল একটু, এত সকালে কালু এল কেন?

সে হাসল কালুর দিকে চেয়ে। কালুর বয়স প্রায় মধ্য তিরিশ হবে। বলা হয় মাস্তানদের চুল পাকে না, কিন্তু কালুর বেশ কিছু চুল পাকা। শুনেছে সে কালু খুব বুদ্ধি ধরে। ঠিক টাইমে জামা পাল্টাবার মাস্টার। এককালে খোকনের হাত ধরে লাইনে নেমেছিল আর খোকনকেই টপকে দিল।

কালু তাকে দেখে বলল “বিল্টু বাবু, সুকাদা পাঠাল। তোমাকে নিয়ে এখুনি কলকাতা যেতে হবে”।

অবাক হল বিল্টু। তার মোবাইল আছে। মোবাইলেই ফোন করতে পারত সুকান্ত। তাহলে প্রস্তুতি নিয়ে আসা যেত।

সে বলল “সে কি? আমি তো ভাল জামাকাপড়ও পড়ে আসিনি”।

কালু কাঁধ ঝাকাল “বাড়ি হয়ে চল তোমার। জামাকাপড় পরে নাও না হয়। তুমি তো আর মেয়েছেলে না!”

কালুর সব ঠিক লাগে বিল্টুর। কিন্তু ওর চোখের দিকে সে তাকালে চমকে ওঠে মাঝে মাঝে।

কেমন একটা হীমশীতলতা আছে। ভয় লাগে।

জামাকাপড় পালটে গাড়ি হাইওয়েতে উঠলে সে কালুকে জিজ্ঞেস করল “কোথায় যাব”?

কালু হাসল “ভবতারিণীর হেড অফিস”।

বিল্টু বলল “কাজ পড়েছে কিছু?”

কালু তার কানে কানে বলল “প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা কালেকশানের এই গাড়িতে যাচ্ছে”।

বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল বিল্টুর। এতগুলি টাকা তাও আবার কালুর সাথে যেতে হচ্ছে ভাবতেই তার কপালে ঘাম আসা শুরু করে দিল।

কালু খিক খিক করে হাসতে লাগল। গাড়ি চালাচ্ছে বলাই। ও ব্যাটাও মাস্তান। তারমানে তাকে হেড অফিসে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে। এরা যাচ্ছে সিকিউরিটি হিসাবে।

কালু বলাইকে একটা খোঁচা মেরে বলল “একটা কাজ করি চল। টাকাটা গাড়িশুদ্ধু মেরে দি। কি বলিস?”

বিল্টু বুঝল কালু ইয়ার্কি মারছে। তবু কালুকে সে বিশ্বাস করতে পারল না। যে হাসতে হাসতে খুন করতে পারে, সে সব পারে।

চুপচাপ বসে থাকল সে।

কালু বলে চলল "উফ মাইরি, পরশুদিন মালটাকে করে যা শান্তি পেলাম না, ডবকা ছিল পুরো। বেশি চ্যাঁচামেচি করায় খালাস করে দিতে হল। এরকম মালের জন্যই এখনও রেপ টেপ করি"।

বিল্টুর এবার ঘেন্না হচ্ছিল খানিকটা। শ্রমিক পল্লির মেয়েটাকে রেপ করেছে কালু সে শুনেছিল। কিন্তু রেপ করে মার্ডার করে এভাবে বুক ফুলিয়ে বলছে দেখে সে খানিকটা চমকেও যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে।

মুখে ভয়ের ভাব করে বলল "কিন্তু পুলিশ..."

কালু খিল খিল করে হেসে উঠল "বিল্টু তুমি এখনও বাচ্চা ছেলে আছ। মেয়েটাকে খালাস করে সবার আগে দাশকে ফোন করেছিলাম। কি বলে জান? বলে, এরকম কচি মাল পেলে আমাকেও মাঝে মাঝে দিস রে... খিক খিক খিক"।

বমি আসছিল বিল্টুর। অতিকষ্টে সামলাল।

বুঝল সে কালুর সাথে বেশিক্ষন কথা বললে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে ঘুমের ভান করল। কালু গাক গাক করে গান চালিয়ে দিল।

#

-কুড়ি লাখ মত কম আছে যে।

ক্যাশের মেয়েটা গম্ভীর চোখে বলল বিল্টুকে।

বিল্টু খানিকটা ঘাবড়ে গেল। সে তো ব্যাগগুলি খোলেও নি। তবে কি কালু এই শয়তানি করল।নিজের হৃদযন্ত্রের শব্দ সে নিজেই শুনতে পারছিল। পাশে কালু দাঁড়িয়ে ছিল। সে কালুকে বলল "কুড়ি লাখ কম বলছে "।

কালু কি বুঝল কে জানে ফোন ডায়াল করা শুরু করল। তারপর তার কানে ফোনটা ধরিয়ে দিল। সুকান্ত। সে ধরা গলায় বলল “কুড়ি লাখ কম আছে বলছে যে”।

ওপাশ থেকে সুকান্তর গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল “ঠিক আছে ওখানেই দাঁড়াও। আমি বলে দিচ্ছি”।

ফোনটা রেখে দাঁড়াল কিছুক্ষন।

ভবতারিণীর অফিসের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কালেকশন সেন্টার। এলাহি ব্যাপার। বড় বড় এসি লাগানো। একেবারে ফ্রিজের থেকেও মনে হয় বেশি ঠাণ্ডা।

তার মধ্যে কুল কুল করে ঘামতে লাগল বিল্টু।

এবার তার ফোনটা বাজতে লাগল। সুকান্ত।কাঁপা কাঁপা গলায় ফোন ধরল সে।

-হ্যালো।

-হ্যাঁ, একটু ওয়েট কর। চিন্তা কোর না। আমিই কুড়ি লাখ কম পাঠিয়েছি। একজন আসবে। একটা সাইন করে দাও। আমি পরে বুঝে নেব।

ফোনটা রেখে টেনশান কমল নাকি বুঝছিল না বিল্টু। এতগুলো টাকা তো তাকে বেঁচেও পাওয়া যাবে না। কি সই করাবে কে জানে।

একজন সুদর্শন স্যুট টাই পরা ছেলে তার দিকে এগিয়ে এল “আপনি পাঠকপাড়া থেকে আসছেন?”

মাথা নাড়ল সে।

ছেলেটা হাসল “আসুন”।

চোখ ধাঁধানো অফিস। লিফটে করে চারতলায় নিয়ে গেল তাকে। কালুরা নিচেই দাঁড়িয়ে। তার বুকটা এখনও দুরুদুরু করে চলেছে।

একটা চেম্বারে ঢোকানো হল তাকে। চেম্বারের বাইরে লেখা “মিস সায়নী সাহা, সিনিয়র অপারেশন ইনচার্জ।

মেয়েটাকে দেখে অবাকই হল সে। একেবারেই বাচ্চা একটা মেয়ে। তাকে দেখে বলল “দেখুন সুকান্ত বাবুর ব্যাপারটায় স্যার কিন্তু খুব রাগ করেছেন। যত তাড়াতাড়ি হয় টাকাটা পাঠাতে বলে দিন”।

সে বলল “আচ্ছা ম্যাডাম”।

সায়নীর মনে হচ্ছিল ছেলেটা বেশি বোঝে না। ওই জন্যই পাঠকপাড়া থেকে একে পাঠানো হয়েছে। ইদানীং পাঠকপাড়ার কালেকশন গুলি মাঝে মাঝেই কম আসছে।

সেন স্যারকে ফোনে জানানো হলে রাগারাগিও করলেন, বললেন সুকান্তর সাথে কথা বলবেন। আপাতত একটা রিসিট কপিতে লিখিয়ে নিতে।

সেরকমই করে নিল সে। অফিস থেকে বেরিয়ে নিচে নামল। কালু দূরে দাঁড়িয়ে রিসেপশনিস্টটাকে মাপছিল।

তাকে দেখেই বলল “কলকাতায় থাকলে শালা এই মালটাকে তুলতাম। খাঁজ দেখেছ শালা। পুরা মাখন”।

কিছুটা টেনশানমুক্ত লাগছিল বলে কালুর কথায় এখন হেসেই ফেলল সে।

২০।

-কালু একটা মেয়েকে রেপ করেছে তুমি জান?

নন্দিতার গলা। রাত একটার সময় নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ওর ঘরে এসে হঠাৎ এমন কথা শুনে কিছুটা চমকে গেল সুকান্ত। তার অন্ধকার ঘরে টিভিটা চলছিল। রাতে আজকাল ঘুম হয় না।জেগে জেগে ফুটবল দেখছিল। রুনি যখন আর্সেনালের গোল পোস্টে ঢুকে পড়েছে তখনই নন্দিতার এরকম বেয়াড়া একটা প্রশ্ন।

নন্দিতা রোজই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। রাত একটায় এরকম প্রশ্ন শুনে ওর দিকে তাকাল সুকান্ত।

বাইশ তেইশ বছর বয়স। রীতিমত সুন্দরী না হলেও একটা অদ্ভুত টান আছে ওর চোখে।

সুকান্ত সোজাসুজি তাকাল ওর চোখের দিকে, "করতে পারে তাতে আমার কিছু যায় আসে না"।

-যায় আসে না? টাকা দিয়ে পুষছ তুমি, তোমার সিকিউরিটি দেখে বেড়াচ্ছে, কলকাতা যাচ্ছে টাকা নিয়ে আর তুমি জান না?

গোলটা মিস করল রুনি। কর্নার।

-ভবতারিণীর সিকিউরিটির জন্য টাকা দিই ওকে। আমার পার্সোনাল কিছুর জন্য না।

-বিষ্ণুদা মার্ডার হয়েছে জান?

চোখ ছোট করল নন্দিতা।

টিভির দিকে চোখ ফেরাল সুকান্ত। একেবারে অপ্রত্যাশিত না।

মুখে বলল "না জানিনা"।

নন্দিতা কোন উত্তর দিল না।

সুকান্ত যোগ করল "তাছাড়া তুমি কি আজকাল আমার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছ নাকি? দেখো আমি একটা অত্যন্ত বাজে লোক। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ রাখি, রেপিস্ট পুষি, সব থেকে বড় কথা তোমার সাথে আমার কোন ফিজিক্যাল রিলেশন নেই। তুমি চাইলে আমি তোমাকে ডিভোর্স দিতে পারি। মিউচুয়ালি করতে পার। অসুবিধে নেই। খোরপোষ চাইলে তাও পাবে"।

রুনির চোট লেগেছে। খোঁড়াচ্ছে।

নন্দিতা ক্লান্তভঙ্গিতে তার পাশে বসল। বলল "আমি তোমাকে আগে বলেছি। আমার পক্ষে কোনকিছু করাই সম্ভব না।তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তাছাড়া আমি ভার্জিন না। তুমিই ঠকবে"।

রুনি উঠে যাচ্ছে। খেলতে পারবে না বোধহয়।

সুকান্ত নন্দিতার দিকে তাকাল। এ তার বউ। কি বলবে সে? সেও তো ঝিমলিকে ভোলার জন্যই নাকি নন্দিতার মধ্যে ঝিমলিকে দেখার জন্যই বিয়ে করেছিল নন্দিতাকে। তাহলে শরীর হিসাবে সেও তো ভার্জিন না।

সে নির্বিকার মুখে বলল "তোমার কি অ্যাবরশন হয়েছিল?"

নন্দিতা কঠিনদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলল "না। কন্ট্রাসেপ্টিভ ওয়াজ ইউজড"।

বাঁকা হল খানিকটা সুকান্ত "অ। তার মানে প্ল্যান প্রোগ্রাম করেই শুয়েছিলে?"

রুনি নামল আবার। খেলবে।

নন্দিতা তার চোখে চোখ রাখল। টিভির হালকা আলোতেও সে চোখ দেখতে পারছিল সুকান্ত। কেটে কেটে বলল "আমি যা করেছি তার জন্য কোন আপসোস করি না। তখন ডিসিশান নিয়েছিলাম। তারপর সন্দীপ লেফট মি। অনেক খুঁজেছি। পাইনি। কিন্তু তখন যা করেছি, যেটা ঠিক মনে হয়েছে করেছি"।

বিয়ের প্রায় তিনমাস বাদে নন্দিতার সাথে এত কথা হচ্ছে সুকান্তর। পাশে বসা নরম শরীরটার দিকে সে আকর্ষণ বোধ করছিল খানিকটা। তবু বিঁধতে ছাড়ল না, "নিজের জীবনটা নষ্ট করলে। আমারটাও করলে"।

একটা শ্বাস ছাড়ল নন্দিতা " তা করলাম"।

সুকান্ত উঠে বসল। নিজের ডান হাত দিয়ে নন্দিতার থুতনি ধরে মুখটা নিজের দিকে ঘোরাল। সুকান্তর নাটকীয়তায় খানিকটা সিটিয়ে গেল নন্দিতা।

ফিসফিস করে বলল সুকান্ত "তা বউমণি তোমার ওপর রাগ করে কি আমার সারাজীবন নষ্ট করব?"

মেজাজ খারাপ হওয়ায় থুতনি ধরেছিল সে। কথাটা বলে হাতটা নামিয়ে নিল।

নন্দিতা বলল "তুমি কি চাও? ডিভোর্স?"

সুকান্ত কিছু বলল না। খেলা দেখতে লাগল। রুনি মাঠময় দাপিয়ে খেলছে। মনে হচ্ছে ম্যান ইউ-র একটাই প্লেয়ার খেলছে আজ।

নন্দিতা কিছুক্ষন চুপচাপ বসে রইল। এবার ধীরে ধীরে উঠল।

বলল "গুডনাইট"।

সুকান্ত নিজেকে সামলাতে পারল না। নন্দিতাকে হাত ধরে টেনে কোলে বসিয়ে ধরে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল। অকস্মাৎ আক্রমণে খানিকটা হকচকিয়ে গেছিল নন্দিতা। পরক্ষণেই সে সুকান্তকে আটকাতে চেষ্টা করল।নন্দিতার গোটা শরীর আদরে ভরিয়ে দিচ্ছিল সুকান্ত। একসময় সুকান্তর পৌরুষের কাছে হার মানল নন্দিতা।

ফ্রি কিক থেকে রুনি যে একটা দুর্ধর্ষ গোল করল, সেটা আর সুকান্তর দেখা হল না।

অনেকদিন পরে সে রাতে দুজনের খুব ভাল ঘুম হল।

21.

নিজের চেম্বারে কাজ করছিল সায়নী, টাকার হিসেব নিয়ে প্রচন্ড ব্যস্ত ছিল, তখনই মোবাইলে একটা আননোন নম্বর থেকে মিসড কল এল। তৎক্ষণাৎ সে কল ব্যাক করল। ওপাশে ফোনটা রিসিভ হল। সে হ্যালো হ্যালো বলতে লাগল। ওপাশ থেকে পরিস্কার গাড়ির হর্নের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তাছাড়া আর কোন শব্দ আসছে না।

বেশ খানিকক্ষণ হ্যালো বলার পরে ওপাশ থেকে তাকে চমকে দিয়ে একটা গলার স্বর ভেসে এল “চিনতে পারছ?”

সায়নী রাগল খানিকটা। “কে বলুন তো? এখন ফালতু ইয়ার্কি করার সময় নেই আমার”।

ওপাশের গলাটা একটু হাসল। “আমি আবীর”।

সায়নী খানিকটা হকচকিয়ে গেল। এতদিন পরে হঠাৎ আবীর কি করছে? সে তো তাকে ভুলেই গেছিল।পরমুহূর্তেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল সে। ফোনটা কেটে দিল।

এত কষ্ট করে যাকে মুছে দেওয়া গেছে, সে কেন আবার তার জীবনে ফিরতে চায়! এরকম তো হবার কথা ছিল না।

ফোনটা আবার বাজছে। ধরল না সায়নী। বেজে গেল।

পরপর পাঁচবার বাজার পর বিরক্ত হয়ে ফোনটা তুলল সে "কি হল?"

ওপাশ থেকে আবীরের করুণ গলা ভেসে এল। "প্লিজ আমার কথাগুলি একবার শোন অন্তত। প্লিজ"।

সায়নী স্থির হল। "বল"।

"ফোনে হবে না সায়নী, আজ বিকেলে একবার ভিক্টোরিয়ার সামনে আসো প্লিজ"।

সে বুঝতে পারল না কি করবে। অফিসে এতগুলি কাজ পরে আছে। সে কাটিয়ে দেবারই চেষ্টা করল "আজ হবে না"।

আবীরের গলা আরও করুণ হল "দেখ, তুমি না আসলে আমি কি করে বলব কি হয়েছিল। তোমার কি সেটাও জানতে ইচ্ছে করছে না?" তারপরে খানিকটা ইতস্তত করে আবীর বলল "তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে?"

"না। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব"। কাঠ কাঠ গলায় কথাগুলি বলে ফোনটা রেখে দিল সায়নী।

চারটে বড় ফাইল, পাঠকপাড়ার গোটা হিসেবপত্র পড়ে আছে। রাত্রে একটা মিটিং আছে। স্যার আজকাল তার ওপরে প্রচন্ড নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। স্যারকে কি আবীরের কথা বলা উচিত?

অনেক ভেবে না বলার সিদ্ধান্তই নিল সে। এতদিন তার সাথে একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। নাই বা সেটাকে খারাপ করল।

একটা ফোনেই ধরে নিলেন স্যার "বল সায়নী"।

সায়নী ফোনটা ধরে সেই মুহূর্তেই ঠিক করে নিল কি বলবে "স্যার আমাকে এক্ষুনি একটু বাড়ি যেতে হবে। একটা কাজ পড়ে গেছে"।

ওপাশ থেকে তমাল সেনের উদ্বিগ্ন গলা ভেসে এল "এনিথিং সিরিয়াস?"

"না স্যার। কিন্তু যেতে হবে"।

"ওয়েল তুমি কি এখনই বেরবে?"

"হ্যাঁ স্যার। ফাইলগুলি কাল করে দেব"।

"না সে ঠিক আছে। আচ্ছা কালই কোর। আর সেরকম কোন সমস্যা হলে আমাকে জানিও"।

"নিশ্চয়ই স্যার। আচ্ছা রাখছি"।

ব্যাপারটা ম্যানেজ করেও সায়নী খুশি হতে পারছিল না। কেন এল এতদিন পরে আবীর আবার? সে পরিষ্কারই বুঝতে পারছিল আবীরের ওপর টানটা একেবারেই আর নেই তার। বরং সেটা পুরোপুরি তমাল সেনের ওপর চলে গেছে। অসম্ভব ম্যাগনেটিক পারসোনালিটি তার। সব সময় কাজের কথা। অথচ কি অসম্ভব কেয়ারিং।দার্জিলিংএ গিয়ে হঠাৎই তার একের পর এক হাঁচি শুরু হয়েছিল। স্যার নিজে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। অত শরীর খারাপের মধ্যেও সে মরমে মরে গেছিল। এত বড় একটা লোক অথচ কি ডাউন টু আর্থ।

ঘড়িটার দিকে তাকাল সে। দুপুর একটা। তাহলে বাড়ি গিয়ে ওখান থেকে যাওয়া যাবে। ড্রাইভার রামুকে ফোন করে গাড়ি বের করতে বলল সায়নী।

#

ইচ্ছা করেই নিজের মেক আপ পোশাক চড়া রাখল সায়নী। আবীরের চোখ ধাধিয়ে যাক আজকে।

গাড়ি পার্ক স্ট্রীটের কাছে আসতে আবীরকে ফোন করল সে "তুমি কোথায়?"

“মেট্রোয় উঠছি”।

“তুমি এক কাজ কর। গোখেল রোডে চলে এস। আমি ওখান থেকে তোমাকে পিক করব”।

ওপাশ থেকে আবীরের চমকে যাওয়া গলা শুনতে পাওয়া গেল “পিক করবে মানে? কিসে আসছ?”

“দ্যাটস আ সারপ্রাইজ”। ফোনটা রেখে দিল সে।

#

লম্বা সেডান গাড়িটায় উঠে আবীরের চমকে যাওয়া মুখটা দেখে মজা পাচ্ছিল সায়নী। রোদচশমাটা খুলল না সে। আবীর আগে কি বলে সেটা জানা দরকার।

বিস্মিত গলাতেই আবীর বলল “তুমি কি লটারি পেয়েছ নাকি?”

সায়নী হাসল না। গম্ভীর গলাতেই বলল “না। ভাগ্যিস তুমি ডিচ করেছিলে। আমি এখন ভবতারিণী কোম্পানির ওয়ান অফ দ্য বোর্ড মেম্বারস”।

“বাহ। এতটা ভাবতে পারিনি। যা তা সারপ্রাইজ তো!”

এই যাতা কথাটা আবীর খুব ব্যবহার করে। আগে বেশ ভাল লাগত। এখন আর লাগছেনা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল সায়নী।

আরেকটু কঠিন হল সে। “কি কারণ যে জন্যে ডেকেছ? বিয়ের নেমন্তন্ন করবে নাকি?” গলার স্বরটা একটু বাঁকা করেই প্রশ্নটা করল সে।

আবীর তার দিকে তাকাল। বলল “তুমি অনেক বদলে গেছ”।

“ওল্ড ডায়লগ। নতুন কিছু শোনাও”।

“শুনতে চাও কি?” চোখটা ছোট করল আবীর।

গা জ্বলে যাচ্ছিল সায়নীর। এতদিন পরে এ কী ন্যাকামি শুরু করেছে?

রামু যাতে শুনতে না পায় এমন গলাতেই ধীরে অথচ দৃঢ় ভাবে বলল “দিনের পর দিন ফোন করে গেছি। ফোন রিং হয়ে গেছে। ধর নি। তারপরে ফোন আউট অফ রিচ। কোন যোগাযোগ নেই। এতদিন বাদে কি ন্যাকামি করতে এসেছ তুমি?”

আবীর তার দিকে ঘুরে বসল। তার রোদচশমাটা দু হাত দিয়ে খুলল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল “আমার চাকরি চলে গিয়েছিল। বেঙ্গালুরুর রাস্তায় আমি ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতাম। বাবা মাকেও জানাইনি। কি করে দিন কাটাতাম আমিই জানি সোনা। অনেক কষ্টে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি পাই। মাসে আট হাজার টাকা মাত্র মাইনে পেতাম। বাড়িতে কেউ জানত না। প্রায় তিন মাস আগে আরেকটা কোম্পানিতে ওয়াক ইনে চাকরি পেয়েছি। ট্রেনিং পিরিয়ড কমপ্লিট করে তারপরে তোমার সাথে দেখা করতে এলাম।তার আগে পারিনি বিশ্বাস কর। কত স্বপ্ন নিয়ে গেছিলাম। কিন্তু চাকরিটা যখন চলে গেল, মনে হয়েছিল আকাশ ভেঙে পড়েছে। কি করব কিচ্ছু বুঝতে পারতাম না। তোমায় ফোন করার মানসিকতাও ছিল না”।

সায়নী আবীরের চোখের থেকে চোখ সরাল না। বলল “আমাকে কি মনে কর তুমি? আমি জানলে কি হত? তোমার বাবা মা জানতে পারল অথচ আমি পেলাম না?”

আবীর কিছুটা উত্তেজিত হয়ে তার ডানহাতটা শক্ত করে ধরল। বলল “ফিরে এসছি তো সোনা। আর কখনও যাব না।ভীষণ বড় ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না। বিশ্বাস কর”।

গাড়িটা ঘুরতে ঘুরতে ময়দানের সামনে চলে এসছিল। সায়নী হাতটা ছাড়িয়ে নিল। বলল “ইটস ওভার।তুমি এখানে নেমে যাও। মেট্রো পেয়ে যাবে। রামুদা গাড়িটা থামাও”।

অবিশ্বাসী দৃষ্টি নিয়ে সায়নীর দিকে তাকাচ্ছিল আবীর। নেমে গেল মাথা নিচু করে। গাড়িটা চললে সায়নী আর

পেছন ফিরে দেখল না। মুখটা কঠিন করে রামুকে বলল “অফিস চল”।

কাজগুলি পেন্ডিং রাখা যাবে না। তাছাড়া এখন বাড়ি গিয়ে সে করবেটাই বা কি? অফিসে তো তবু স্যার আছেন...

২২।

সুরজিত শিকদার অবশেষে দলবদল করলেন। দলবল বলতে ছিল তিনজন তার অনুগামী। পরের দিন কাগজে ছোট করে এক কোণায় লেখা ছিল। এককালের দাপুটে নেতার জার্সি বদলের খবর। শোনা যাচ্ছে বড় কোন পদ দেওয়া হতে পারে পুরস্কার স্বরূপ।

তরুণ সুরজিতকে নিয়ে আবেগঘন বক্তৃতা দিল। সুরজিত বাবু এলাকার জন্য কাজ করতে চান। তিনি একজন সৎ লোক ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুকান্ত সবই দূর থেকে দেখছিল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল গিয়ে মাইকটা খুলে সুরজিত তরুণ দুজনকেই গুলি করে দেয় কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে আটকাল। আজকাল মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। সেই রাতের পর থেকে নন্দিতা আর সে স্বাভাবিক জীবনযাপনই করছে। আজকাল একটা অপরাধবোধও কাজ করছে তার বিষ্ণু কর্মকারের ব্যাপারে।

কালুর হাত দিয়ে দু লাখ টাকা বিষ্ণুর বাড়ি পাঠিয়েছে সে। বিষ্ণুর বাবা কেঁদে টেঁদে একসা হয়েছে।

তরুণদা ফোনে ডাকছিল। সে যায় নি। মাথা ঠিক রাখতে পারবে না বলেই যায় নি। তরুণ আর সুরজিতের বেশ গলায় গলায় ভাব বোঝা যাচ্ছে। তাকে দেখে সুরজিত হাসি হাসি মুখে একবার বলেওছে “চ’ আবার একসাথে নেমে পড়ি কি বলিস?”

রক্ত তখনই মাথায় উঠে গেছিল। এখন গেলে আর দেখতে হবে না।

অনুষ্ঠান শেষে সুরজিতকে তুলতে যে গাড়ি এল তাতে অনেকদিন বাদে ঝিমলিকে দেখতে পেল সুকান্ত। একটু মুটিয়েছে। মুখের মধ্যে একটা সুখী সুখী ভাব স্পষ্ট।

অনেকদিন পরে সে বুঝল ঝিমলির চলে যাওয়া ক্ষতে কিছু পলি পড়েছে কারণ আজ আর তার বুকে চিনচিনে

ভাবটা হচ্ছিল না।

সুরজিতকে গাড়িতে তুলে তরুণদা তাকে ডাকল। এবার গেল সে। তাকে পাশে বসিয়ে বলল “আরে বোকা তোকে ডাকছি আর তুই চলে যাচ্ছিস কেন? এটা রাজনীতি। মাধুরী দীক্ষিতের বুকের থেকেও বেশি ভাজ এর। মাথা গরম করিস না খামোখা। বরং খেলাটা খেল অনেক মজা পাবি”

সুকান্ত কথা বলছিল না। তরুণদার কথা শুনতে আজকাল ভাল লাগে না। তাছাড়া বেশ কদিন হল রাত দশটার পরে শঙ্কর ঘোড়ুই তাকে ফোন করে খবরাখবর নিচ্ছে। বোঝা যায় শঙ্কর আজকাল তরুণদাকে পছন্দ করছে না।

পছন্দ না করার কারণও আছে। আজকাল নিজের খুশিতে যা ইচ্ছা তাই করে যাচ্ছে। সুরজিত শিকদারকে নিয়ে সিদ্ধান্তটা একান্তই তরুণের। হাইকম্যান্ডকে অনেক পরে জানানো হয়। সে নিয়ে শঙ্করের ভালো ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

চুপচাপ বসেছিল সে।

তরুণ একাই বকবক করে যাচ্ছিল “শোন দল বড় হচ্ছে, এখন অনেক কিছু দরকার। তাছাড়া সামনে ভোটও আছে। তমাল বাবুকে বলে বেশ কিছু টাকা আলাদা করে রাখিস। লোকসভার জন্য অনেক ফ্লেক্স লাগবে। এই টাকাগুলি জোগাড় করতে হবে তো কি বলিস?”

সুকান্ত হালকা ভাবে হ্যাঁ বলল একটা।

তরুণ তার কানে কানে বলল “একটা খবর জানিস তো?”

সুকান্ত কৌতূহলী চোখে তাকাল। তরুণ বলল “আজকে লোকসভার ক্যান্ডিডেট বাছাই। আমাদের এলাকা থেকে আমার নামটাও আছে। যদি সিলেক্টেড হই আজ রাতেই পার্টি”।

ভাল লাগছিল না সুকান্তর। সে বলল “বাঃ। ভালই দাদা। আচ্ছা আমি এবার উঠি। কলকাতায় যেতে হতে পারে”।

তরুণ ঘড়ি দেখল। অবাক চোখে বলল “সে কি? এখন তো সন্ধ্যে প্রায়। এখন কি?”

সুকান্ত বলল “কোম্পানির কাজে। কাল আসব দাদা চলি”। উঠল সে।

সুকান্তর চলে যাওয়াটা দেখল তরুণ। বোঝা যাচ্ছে সুকান্ত ব্যাপারটা ভাল ভাবে নিতে পারবে না।

#

নন্দিতা বাপের বাড়ি গেছে একদিন হল। সুকান্তর বাড়িতে এসে একঘেয়ে লাগছিল। কদিন একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক তাকে কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছিল। এখন আবার সেই পোকাটা নড়ছে। সে ফোন করল নন্দিতাকে। একটা রিংয়েই তুলল নন্দিতা। বলল “বল”।

- কেমন লাগছে বাপের বাড়ি?

- ভাল। তোমার কি হল?

- ভাল লাগছে না। তোমাকে নিয়ে আসতে ইচ্ছা করছে।

ফোনে হাসির শব্দ পেল সুকান্ত। চুপচাপ শুনল হাসিটা। নন্দিতা পরক্ষণেই সিরিয়াস হল। বলল “আস তবে। নিয়ে যাও আমায়”।

ঘড়ি দেখল সুকান্ত। আটটা বাজে। কলকাতা যেতে যেতে এগারোটা বেজে যাবে। যাক।

বলল “আসছি। রেডি থেকো”।

- আচ্ছা, আজ রাতে এখানেই থেকে যেও। কাল না হয় ফিরব?

মানল না সুকান্ত। বলল “নাহ। ভাল্লাগছে না। ভাবছি তোমাকে তুলে সোজা দীঘা যাব। কালকের দিনটা থাকি

ওখানে। কোম্পানির গেস্ট হাউস হয়েছে। বুক করে দিচ্ছি এখনি”। শেষের দিকে তার গলাটা উৎসাহিত শোনাচ্ছিল।

নন্দিতা উত্তর দিল না কয়েক সেকেন্ড। তারপরে বলল “আস”।

ফোনটা কাটতে দেখল একটা মিসড কল আছে শঙ্করদার। সে কলব্যাক করল।

বেশ কিছুক্ষণ রিং হবার পরে শঙ্কর ফোনটা ধরল। গম্ভীর গলা।

“সুকান্ত একটা কাজ করতে পারবে?”

সুকান্ত বুঝল ব্যাপার গুরুতর। সে বলল “বলুন দাদা”।

পাঁচ সেকেন্ড থেকে শঙ্কর বলল “পলাশ পাঁজাকে উপড়াতে পারবে?”

পলাশ পাঁজা তরুণের ডান হাত হয়েছে এখন। বেশ কিছুদিন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল ভোটের পরে। একসময় এলাকার ত্রাস ছিল। এখন রাজনৈতিক আশ্রয়ে নিরাপত্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুকান্ত চোয়াল শক্ত করল “কবের মধ্যে চাই দাদা?”

-ধর আজকেই? তরুণের বিষ দাঁত হয়েছে। যেখানে সেখানে কামড়ে বেড়াচ্ছে। তুমি কালুকে দিয়ে ওকে নামিয়ে দাও। তারপরে দেখছি তরুণকে আমি। ও কার শেল্টারে বড় বুকনি মারে দেখব আমি।

সুকান্ত বলল “হয়ে যাবে দাদা”।

খুশি হল শঙ্কর। বলল “গুড। অপারেশন শেষ হলে খবরটা দিও। তারপরে তরুণকে একটা ফোন করার আছে। আর হ্যাঁ, কালু যেন কিছুদিন আন্ডারগ্রাউন্ড থাকে”।

সুকান্ত ফোনটা রেখে এবার কালুকে ফোন করল। পাওয়া যাচ্ছিল না। বিরক্ত হল সে। কাজের সময় পাওয়া না গেলে এদের পুষে লাভ নেই। শেষ চেষ্টা হিসাবে বিল্টুকে ফোন করল সে।

"হ্যালো। বিল্টু তোমার সাথে কালু আছে?"

ওপাশ থেকে বিল্টুর গলা পাওয়া গেল "না তো। সেই সকালে একবার অফিসে এসছিল তারপরে আর দেখি নি"।

"তুমি ওকে দেখলেই আমাকে ফোন করতে বলবে, আর মোবাইলে তুমিও চেষ্টা কর। পেলে জানিও আমায়"।

কালুকে না পাওয়া গেলে আজ রাতের মধ্যে ব্যাপারটা নামবে কি করে! সে দুবার চিন্তা করল না। গাড়ি নিয়ে বেরল নতুন পাড়ায় তার ফ্ল্যাটের দিকে। এখানে একবার ঢু মারাই যেতে পারে।

#

ঘরেই ছিল কালু। মদের বোতল নিয়ে ক্রিকেট দেখছিল।

সে ঘরে ঢুকে সরাসরি বলল কালুকে "আজ একটা কাজ আছে কালু"।

কালু লাল চোখে তাকাল তার দিকে "বলুন দাদা"।

-রাতের মধ্যে পলাশ পাঁজাকে নামাতে হবে।

কালু মাথা নাড়ল জোরে জোরে। "কি যে বলেন সুকাদা, আজ রাতে কি করে হবে?"

সুকান্ত অধৈর্য হচ্ছিল। বলল "আমি বললাম তো? এবার দেখো যা করার হয় কর"।

কালু চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল “চেষ্টা করছি”।

কালুকে সে বলল না এলাকা ছাড়তে। আজকাল বড় ত্যাদরামি শুরু করেছে কালু। সে ঘরে ঢুকল চেয়ার ছাড়ল না। নিজে বোতল খেয়ে যেতে লাগল।

কেমন হয় যদি আজকে কালুকেও উপড়ে ফেলা যায়? কালুর সাবস্টিটিউট অনেক পাওয়া যাবে। চাল ছড়ালে কাকের অভাব হবে না।

ফোনে একটা মেসেজ এল। তরুনদা। অনেককে পাঠিয়েছে বোঝা যাচ্ছে “পার্টি হ্যাজ সিলেক্টেড মি অ্যাস অ্যা ক্যান্ডিডেট ফর ফোর্থ কামিং পার্লামেন্ট ইলেকশন। নিড ইওর সাপোর্ট”।

#

পলাশ পাঁজাকে আজ রাতেই ওড়াতে হবে। অ্যাট এনি কস্ট। শঙ্করদার অর্ডারের গুরুত্বটা এবার বুঝতে পারছে সুকান্ত।শঙ্করদা এই খবরটা নিশ্চয়ই আগে পেয়েই তাকে ফোন করেছিল। এই ভোটটা তরুণকে জিততে দেওয়া যাবে না।

আর তার জন্য প্রথম ধাপ, পলাশ পাঁজা।

২৩।

বিল্টু অফিসে বসে ছিল। কলকাতা থেকে নাকি একটা বড় পার্টি আসার কথা। সকালে দীঘা থেকে সুকান্ত ফোন করে বলেছে সকাল ন'টার মধ্যে অফিসে চলে আসতে। সাইকেল নিয়ে আটটার মধ্যেই বাড়ি থেকে বেড়িয়েছে সে।

কম্পিউটার দিয়েছে একটা এই অফিসে। সাইটে সেভাবে কাজ কিছুই শুরু হয় নি। কিন্তু অফিসটা একেবারে চকচক করছে। একটা মেয়েকেও নাকি খুব শিগগিরি রাখা হবে। বিল্টু ভাবে মেয়ে দিলে খারাপ হয় না। সারাদিন খুব বোর লাগে। ভাল হয় সুন্দরী কেউ আসে।

আজকাল বাড়িতে বিয়ের কথা উঠছে। সেও ভাবে বিয়েটা আর দেরী করা যাবে না। বেকার তো আর নেই এখন। এর মধ্যে এক রোববারে একটা মেয়ে দেখা হয়েছে। মেয়েটা দেখতে শুনতে খারাপ না। সমস্যা হল মেয়েটার মামার কথাবার্তা খুব ট্যারা। প্রায়ই ঘুরে ফিরে শুনতে হচ্ছিল সরকারি চাকরি হলে ভাল হত।

কম্পিউটারে তাস খেলছিল সে। অলস সকাল। গরম ভালই পড়েছে। এখনও অফিসে এসি আসেনি। সেটাও সাইটে কাজ শুরু হতেই এসে যাবে।আপাতত টেবল ফ্যানেই কাজ চালাতে হচ্ছে।

ফোনটা বেজে উঠল। বাবা। ভ্রুটা কুচকাল তার। অফিসে এসে তো বাবা ফোন করে না। তাহলে নিশ্চয়ই কোন জরুরি দরকার।

সে হ্যালো বলার সুযোগ পেল না, ওপাশ থেকে বাবার ভয়ার্ত গলা ভেসে এল "হ্যারে খোকন তুই কোথায়?"

সে বুঝল না বাবা এত ভয় পেয়েছে কেন। সে বলল "অফিসে, কেন কি হয়েছে?"

"আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। পটলার দোকানে সামনে গোলাগুলি হয়েছে। তোদের কালু আর পলাশ পাঁজা দুজনেই স্পট ডেড। বিরাট ঝামেলা। তুই অফিসেই থাক, বেরোস না কোথাও"। ওপাশ থেকে বাবার উদ্বিগ্ন গলা ভেসে আসছিল।

হঠাৎই মাথাটা ঘুরে উঠল তার। এতো ভাবাই যায় না। সে বাবাকে নিয়ে চিন্তিত হল "তুমি কোথায়?"

"আমি বাড়ি ফিরে এসছি। বাজারটা হল না। সে যাক গে তুই সাবধানে থাকিস"।

বাবা ফোনটা রাখতে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বিল্টু।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কাল বিকেলেও অফিসে এসছিল কালু। মেয়ে দেওয়া হবে অফিসে শুনে দাঁত বের করে বলেছিল "তাহলে তো আমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে কাকা, তুমি ভদ্র বাড়ির ছেলে তুমি এসব পারবে না"।

এ'কদিনে কালুর সাথে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল তার। বলেছিল ক্লাস নাইনে পালিয়ে বিয়ে, খুন, রেপ ইত্যাদি

অনেক গল্প হত। সময়মত দল বদলাতে পারা নিয়ে প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিল।

শুধু একটা হিসেব মেলানো যাচ্ছিল না। পলাশ পাঁজা আর কালু তো একই দলের ছিল। হঠাৎ কি হল যে এরকম একটা ঘটনা হয়ে গেল!

ফোনটা আবার বাজছে। বিরক্ত হল সে। এবার বাড়ি থেকে একের পর এক ফোন আসবে।

বাড়ি থেকে না। সুকান্ত।

"হ্যালো"।

"বিল্টু, কিছু ছেলে যাচ্ছে। ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর। আর কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে না। ব্যাপারটা টপ সিক্রেট কিন্তু"। গলাটা চাপা। বিল্টুর একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু সেটা সে গোপন রাখল। বলল "তুমি কি জান কালু আর পলাশ পাঁজা খুন হয়েছে নিজেদের মধ্যে..."

কথা শেষ করতে না দিয়ে সুকান্ত বলল "জানি। ছেলেগুলো এলে আবার ফোন কোর"। ফোনটা কেটে গেল।

বিল্টু বসে বসে ঘামছিল। সুকান্তর ব্যাপারে শোনা যায় খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে। মুহূর্তের সিদ্ধান্তে বড় বড় কাজ করে ফেলে। ইদানীং কালুর ব্যাপারে শোনা যাচ্ছিল বিরক্ত ছিল। সেটাই কি মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল কালুর?

আর পলাশ পাঁজার ব্যাপারটা বোঝা গেল না।

#

কম্পিউটারটা শাট ডাউন করে অফিসের সামনে পায়চারি করতে করতেই একটা টাটা সুমো এসে দাঁড়াল তাদের নির্জন অফিসের সামনে।

গাড়ি থেকে নামল পাঁচটা ছেলে। বিল্টু দেখছিল খুব বেশি হলে বাইশ থেকে তেইশের মধ্যে বয়স হবে

চারজনের।রোগা রোগা ছেলেগুলো। চুল উসকো খুসকো। শুধু একজনের বয়স পঞ্চাশের ওদিকটায় হবে।মাথায় কাঁচা পাকা চুল। কিছুটা ভদ্রলোকের মত দেখতে। প্যান্টের পকেটের কাছগুলি সবারই উঁচু।বিল্টু বুঝে গেলে মেশিন আছে নির্ঘাত। কালুও এভাবেই চলা ফেরা করত।

তাকে দেখে বয়স্কমত লোকটা বলল “আপনি সুব্রতবাবু তো? আপনাকে সুকান্ত বাবু আমাদের ব্যাপারে বলেছে?”

সে হাসার চেষ্টা করল। বলল “হ্যাঁ আসুন”।

তাদের অফিস ঘরের পাশে একটা বড় হলঘর মত আছে। সেই ঘরটা খুলে ফ্যানগুলি ছেড়ে দিল সে।

ছেলেগুলি ধপ ধপ করে শতরঞ্চির ওপরেই বসে পড়ল। সে বুড়োটাকেই প্রশ্ন করল “আপনারা সবাই মাংস খান তো? তাহলে রুটি মাংসের ব্যবস্থা করি?”

বুড়োটা বলল “হ্যাঁ, মাটন পাওয়া যাবে?”

সে বলল “হ্যাঁ, এই তো পাশের ধাবা থেকেই নিয়ে আসব”।

“আচ্ছা, তাহলে মাটন হলে তো ভালই হয়। আর যদি একটা রামের দু লিটার পারেন। কি বলিস?” বাকিদের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করল বুড়োটা।

বাকিরা শুয়ে পড়েছিল। রামের কথা শুনে একসাথে হইচই করে উঠল।

বিরক্ত হচ্ছিল বিল্টু। যেন চাকর পেয়েছে তাকে। মুখে কিছু বলল না। সুকান্তর গেস্ট মানে তাকে আদর যত্ন করতেই হবে। আফটার অল সুকান্ত তার অন্নদাতা। কিন্তু মদের বোতল তাকে দিয়ে আনানোটা বাড়াবাড়ি।

ঘর থেকে বেরিয়ে সুকান্তকে ফোন করল সে।

ফোনটা ধরেই সুকান্ত চাপা গলায় বলল “এসছে?”

-হ্যাঁ।

-ওরা কিন্তু দু তিন দিন থাকতে পারে জিজ্ঞেস করে নিও।

-আচ্ছা।

-দুপুরের খাওয়াটা তুমি একটু কষ্ট কর, রাত থেকে আমি পাঠকপাড়া থেকে শম্ভুকে বলে দেব। আর ওদের কি কি লাগবে একটা লিস্ট করে নাও। সন্ধ্যেয় বাজার থেকে কিনে নিও।

-বাজার মনে হয় সন্ধ্যে বেলা বন্ধ থাকবে।

-কেন?

-ওই যে মার্ডারগুলি হয়েছে।

-হুম। ঠিক আছে। তুমি লিস্টটা আমার বাড়িতে শম্ভুর কাছে দিয়ে দিও।

-আচ্ছা, বলছিলাম রামের বোতল চাইছে। কি করব?

খানিকটা থমকাল সুকান্ত। বলল “আচ্ছা তোমাকে আনতে হবে না। আমি শম্ভুকে বলে দিচ্ছি। ওদের বল বিকেলে পাবে ওটা”।

কিছুটা কৃতজ্ঞ বোধ করছিল বিল্টু। যাক ছেলেটা এটুকু সম্মান দিল একই স্কুলের সিনিয়রকে।

#

খাবার দাবার এনে হলঘরে ঢুকতে বিল্টু দেখতে পেল ছেলেগুলি টেবিলের ওপরে মেশিনগানটান সাজিয়ে রেখেছে।

কোনটাকে মেশিনগান বলে কোনটাকে পাইপগান বলে কোনটাই জানে না সে। কালু একটা অটোম্যাটিক রিভলভার নিয়ে ঘুরত সেটা তাকে দেখিয়েছিল।

বুড়োটা শুয়ে ছিল। সে তাকেই উদ্দেশ্য বলল "টেবিলটা একটু ক্লিয়ার করা যাবে স্যার?"

বুড়োটা বলল "টেবিলে কি দরকার, আমরা শ্রমজীবী মানুষ মাটিতেই রেখে দিন না। ও আমরা বুঝে নেব"।

সে বলল "আপনাদের কি কি দরকার একটা লিস্ট করে দিতে বললেন সুকান্ত বাবু। কালকে সকালের মধ্যে পাঠিয়ে দেব"।

বুড়োটা উঠে তার কানে কানে বলল "দু-চারটে ডবকা মাগী জোগাড় করতে পারবেন? আজ একটা খুব বাজে অপারেশন গেছে। বড় ক্লান্তি লাগছে"।

এবার বিল্টুর ক্লান্তি লাগছিল। সে মেশিনগুলোর দিকে আড়চোখে একবার দেখে বলল "বলে দেখছি"।

বুড়োটা গম্ভীর হল "আর একটা পেন আর কাগজ দিন। অনেককিছু আনাতে হবে"।

24.

দুপুরে নন্দিতার একটু আগেই ঘুম ভাঙল সুকান্তর। ঘরটা অন্ধকার করা আছে। জানলার কাঁচ দিয়ে শেষ বিকেলের একটা হালকা আলো এসে আলোর কাজ করছে। তাকে পরম নির্ভরতায় জড়িয়ে আছে নন্দিতা। উঠল না সে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় এরকম এক দিনে বাবা ঠিক বিকেলবেলায় তাকে নিয়ে বেরিয়েছিল সাইকেলে করে। একটা দোকানে গিয়ে লাট্টু কিনে দিয়েছিল। সব কিছু ভুলে গেলেও সে দিনটার কথা ভুলতে পারে না সুকান্ত। তখন কি নিশ্চিন্তে রাতে ঘুম আসত। দুপুরে ঘুম আসত। এখন কিছুই আসে না।নন্দিতা না থাকলে এই দুপুরটাও ঘুম হত না।

ফোনটা সাইলেন্ট করা ছিল। হাত বাড়িয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সাতটা মিসড কল তরুণদার। মুচকি হাসল সে। ল্যাজে আগুনটা লেগেছে তাহলে। সুরজিতের সাথে খুব ইয়ে হচ্ছিল। এবার দৌড়ে বেরাক।

শুয়ে শুয়ে হিসাব করে নিচ্ছিল সে। সুরজিতের জন্তু খোকন, কালু, পলাশ পাঁজা তিনটেই এখন খরচের খাতায় চলে এসছে। বাকি রইল পিন্টু। সে তিনমাস ধরে জেলে আছে। সুরজিতের চামচা ছিল এককালে। যেদিন বেরবে সেদিনই না হয় খরচা করে দিতে হবে।

আজকের ঘটনায় তাকে সব থেকে বেশি তৃপ্তি দিয়েছে কালুর ব্যাপারটা। ব্যাটা বড্ড বাড় বেড়েছিল। কোনদিন দেখা যেত তাকেই হুমকি দিয়ে বসল।

ঠিক সময়ে ঠিক চালটা হয়েছে। এখন শঙ্করদা গণেশের যে ছেলেগুলিকে পাঠিয়েছে, তাদের লোকসভা ভোট অবধি তার কাছেই রেখে দিতে হবে গোপনে। কালু যে ফ্ল্যাটে থাকত সেখানে রাখা যাবে না। তাহলে সবাই জেনে যাবে। আপাতত ফ্ল্যাটের সাইট অফিসে দুদিন থাক। তারপর না হয়...

শঙ্করদা ফোন করে কনগ্রাচুলেট করেছে। বলল তরুণের ওপর একটা চাপ তৈরি করা হচ্ছে এখন দল থেকে যাতে নমিনেশন ফাইল না করে। তরুণকে আটকাতে পারলে নাকি তাকেই দল টিকিট দেবে।

শুনে একটু চমকে গেছিল সুকান্ত। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে দেখেছে রাজনীতিটা এবার সামনাসামনি করাই ভাল। কারও চেলা হয়ে, কারও ইনভেস্টর হয়ে করার থেকে নিজে নেমে পড়াই ভাল। তাছাড়া তরুণের মত আকাট রাজনীতি করতে পারলে সেও করবে।

সুরজিতের বাড়ি যখন যেত তখন দেখত ওর বুকসেলফে প্রচুর বই সাজানো। সবই নাকি দেশ বিদেশের বই। একটাও পড়েছে নাকি সন্দেহ আছে। মুখে যত বড় বড় বুলি ছিল। অতই যদি বুলি ছিল তাহলে জার্সি পাল্টাল কেন? আসলে এরা রাজনীতি মানুষের জন্য কোনদিনই করে নি। করেছে নিজের জন্য।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল সুকান্ত। সে কি রাজনীতি করবে? কেন করবে? তার কি কোন আদর্শ আছে? যখন

সুরজিতের বাড়িতে কুকুর ছাগলের মত বসে থাকত, সুরজিতের মেয়েকে নিয়ে যেত তখন কি রাজনীতি করেছে সে? নাকি চাকরির জন্য, ঝিমলির জন্য রাজনীতি নামের খেলাটাকে নিজেকে জড়িয়েছিল সে!

কিসের আদর্শ? শহরের একটা অংশে দিনের পর দিন রাস্তা করা হত না যেহেতু সেখানে ভোটে বরাবর হারত বলে।যে গ্রামে তাদের ভোট নেই সেখানে ইলেক্ট্রিসিটি দিতে গড়িমসি চলে। তাদের পার্টির না হলে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয় না। চাকরি দেওয়া হয় যোগ্যতা অনুসারে নয়। পার্টির অনুগত থাকলে। গোটা এলাকায় কেবল ফল্ট হলে সুরজিত তরুণের বাড়িতে সবার আগে আলো জ্বলে। সবার আগে জলের ব্যবস্থা হয়। ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসে সবার আগে মানুষকেই ভুলে যায় এরা।দিনের পর দিন কুকুরের মত খাটিয়ে চাকরি হবার প্রতিশ্রুতিতে সুরজিতের বাড়িতে গিয়ে শুনেছিল ম্যুনিসিপালিটির এক মাত্র পোস্টে তাকে না। নিজের ভাইপোকে চাকরি দিয়েছে সুরজিত। এই রাজনীতি করবে সে?

উত্তেজিত লাগছিল খানিকটা। অনেকদিন এভাবে নিজের কথা ভাবার সময় পায় নি সে। উঠে মাথায় ঘাড়ে জল দিল।

নন্দিতাকে ডাকল না সে। ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে এল। অস্তমিত সূর্যের আলোয় মায়াময় লাগছিল সমুদ্র। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে দেখল। বেরল এবার ঘর ছেড়ে। ভবতারিণীর এই গেস্ট হাউসটা বিরাট। জিনিসের দামও বেশি। যে সিগারেট বাজারে কুড়িটাকা এখানে তিরিশ নিচ্ছে। সেটা অবশ্য নিতে হবে। লাক্সারি ট্যাক্স না কি সব গালভরা নাম টাম আছে।

সকালে টের পায় নি। এখন মনে হচ্ছিল চারদিকে একটা তটস্থ ভাব। ফিনাইল দিয়ে সব ধোঁয়া হচ্ছে। কেউ আসবে মনে হচ্ছে।

রিসেপশনেই জিজ্ঞেস করল সে। তমাল সেন এসছে।

এবার বোঝা গেল ব্যাপারটা।

বস আসলে এসব তো করতেই হবে। সিগারেট নিয়ে ঘরে ফিরে দেখল নন্দিতা উঠেছে। তাকে দেখে হাসল। বলল "বেরবে তো?"

সুকান্ত বলল "হ্যাঁ, চল, মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছে করছে ভীষণ"।

নন্দিতা অবাক হল খানিকটা “সে কি? ওই বেসনের মাছ ভাজা খাবে?”

সুকান্ত হাসল “ছোটবেলা থেকে হাইজিন টাইজিন কিছুই তো দেখলাম না। এখন ক’টা টাকা এসছে বলে কি আর ওসব দেখলে চলে?”

নন্দিতাকে নিয়ে বেরতেই সুকান্ত দেখতে পেল তমাল সেন এক মেয়েকে নিয়ে বেরচ্ছে। সুকান্ত এই মেয়েটাকে হেড অফিসে দেখেছিল। এখন ঠিক মনে করতে পারল না।

তাকে দেখে তমাল সেন এগিয়ে এল।

“আরে তুমি? হানিমুনে নাকি?”

নন্দিতা হাত তুলে নমস্কার করল। মেয়েটি তাকে দেখে হাসল।

তমাল সেন এবার তাদের ছেড়ে দিতে চাইল “ঠিক আছে, তোমাদের আর বিরক্ত করব না, তোমরা একা সময় কাটাও এখন। আমার আর সায়নীর একটা মিটিং আছে এখানের লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে। হোপ টু বাই অ্যানাদার গেস্ট হাউস অ্যাট মন্দারমণি”।

সুকান্ত “বেস্ট অফ লাক” বলে বেরিয়ে এল।

নন্দিতা বলল “ওই মেয়েটা আর তমাল বাবু কি একই ঘরে থাকেন নাকি?”

সুকান্ত এতটা ভেবে দেখেনি। সে কাঁধ ঝাঁকাল “থাকলেই বা কি? তমাল সেন এরকম পাঁচশো মেয়ে পুষতে পারে”।

-কত টাকা আছে লোকটার?

-তা জানি না, তবে শুনেছি গোটা পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের বেশি জমি কিনে নেওয়ার টার্গেট আছে নেক্সট পাঁচ বছরে।

চোখ বড় বড় করল নন্দিতা। “বল কি?”

-হ্যাঁ, আমাদের লাস্ট মিটিংয়ে তো সেরকমই বলা হয়েছিল। এখন সরকারের যা নিয়ম আছে তাতে সরকার জমি দখল করে দেবে না। আমাদেরই কিনে নিতে হবে। সরকার নিলেই হাজারটা কথা। জমি আন্দোলন। কি দরকার সে ঝামেলায় গিয়ে। আমরা তো চুপচাপ কিনে নিচ্ছি। কোন ঝামেলা নেই। কেউ জানেও না।

নন্দিতা অবাক হল। বলল “এ তো তাহলে ধীরে ধীরে প্যারালাল গভর্নমেন্টের মত ব্যাপার হচ্ছে”।

সুকান্ত হাসল। বলল “হোক না। লোকজন তো করে কম্মে খাচ্ছে। সেটাই বা মন্দ কি?”

কথা বলতে বলতে সমুদ্রের ধারে চলে এসেছিল তারা। প্রচুর লোক বসে হাওয়া খাচ্ছে। একেবারে জমজমাট জায়গাটা।

সুকান্তর ফোনটা বেজে উঠল। তরুণদা। এবার ধরল সে।

-কিরে তোকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

-দীঘা এসছি দাদা।

-ভাল করেছিস। কিন্তু এটা তুই কি করলি?

যেন কিছুই জানে না এমন একটা ভাব করে সুকান্ত বলল “কি করলাম?”

-পলাশকে মার্ডার করালি কেন? এবার সামনের ইলেকশনটা আমার কি হবে বল তো!

আকাশ থেকে পড়ল যেন সুকান্ত। “আমি? কি যে বল তরুণদা? আমি করাতে যাব কেন?”

মুহূর্তে তরুণের গলার স্বরে বদল এল। গলাটা চেপে বলল “শোন সুকান্ত। রাজনীতিতে আমার বাল পেকে গেল। সেই ছোটবেলা থেকে রাজনীতি করছি। আমার সাথে খেলার মাসুলটা জানিস তো? তোর এই বাড়বাড়ন্ত একদিনে শেষ করার ক্ষমতা রাখি মনে রাখিস। শঙ্কর ঘোড়ুই এর চামচা হয়েছিস তো? তোকে আর তোর বাপ শঙ্করকে ল্যাঙটো করে যদি পাঠকপাড়ায় না ঘুরিয়েছি তবে আমি আমার নাম পালটে তরুণ হাজরা থেকে কুত্তা হাজরা রাখব। মনে রাখিস”।

ফোনটা কেটে গেল।আশেপাশের সবাইকে চমকে দিয়ে হো হো করে উঠল সুকান্ত।

25.

“সুকান্তকে পেলে?”

তরুণকে সোফায় বসে থাকতে দেখে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন সুরজিত।

-পেয়েছি। এমন ভাব করছে কিছুই জানে না।

সুরজিত সোফায় বসলেন। বললেন “নতুন নতুন পাখা গজিয়েছে। একটু উড়তে দাও”।

তরুণ ব্যাজার মুখে বলল “সামনে লোকসভা ভোট। সুকান্ত উড়ে বেড়ালে আমার ভোটব্যাঙ্কের বারোটা বেজে যাবে”।

সুরজিত এবার গম্ভীর মুখে বললেন “হুম। তা কালুকে ওড়াল কেন কিছু বোঝা গেল?”

তরুণ মাথা নাড়াল। বলল “কি যে চিন্তা করছে ওই জানে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে এর মধ্যে শঙ্করের হাত আছে”।

-কেন?

-আমি এম পি হলে শঙ্করের ভ্যালু কমবে এলাকায়। তাছাড়া আরও অনেক ব্যাপার আছে সেটা তুমি বুঝবে না।

-আমি বুঝব না কি বলছ হে? চুল পেকে গেল এতদিনে।

বুঝদারের মত হাসি হাসলেন সুরজিত।

তরুণ বলল "ওই যে একটা পার্টি আছে না যাদের মেয়েরা বিয়ে না হবার ফ্রাস্ট্রেশনে পুলিশের সামনে গিয়ে খালি ঝামেলা করে..."

সুরজিত বললেন "বুঝেছি বলে যাও"।

-ওদের এক নেতা ফোন করেছিল। বলছে আমি দাঁড়ালে প্রার্থী দেবে না।

-বেশ তো। তাতে কি?

-তাতে কিছুই লাভ নেই।

-রাজনীতিতে পিঁপড়েও লাভের রে ভাই। এত অস্থির হোয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। চিন্তার ব্যাপার আছে। সুকান্তর ডানা এত বাড়ছে কেন জানতে হবে আগে। ব্যাটা কিনা আমার বাড়ির সামনে একদিন মাঝরাতে পেচ্ছাপ করেছে। কি সাহস!

তরুণ সুরজিতের দিকে তাকাল। বলল "আমি সুকান্তকে বারবার বলছি ওরে রাজনীতিতে ব্যক্তির কোন জায়গা নেই। সুরজিতদার সাথে তোর যা হয়েছে হয়েছে, এবার ভুলে যা। চ মিলেমিশে করি যা করার। তা চোরা না শোনে ধর্মের কথা"।

-তার মানে আমি থাকাটাই ওর সমস্যা তো?

-তাছাড়া কি?

- তাহলে?

-তাহলে কিছু না। ওকে আমি যা বলেছি, তাতে যদি ওর বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকে তবে এই ভ্যানতাড়ামো বন্ধ করবে।

সুরজিত কিছুক্ষণ চুপ করে তরুণের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপরে বলল “একটা কাজ করবে?”

তরুণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

সুরজিত সিগারেট ধরালেন একটা। বললেন “একটা ডায়েরি ঠুকে দাও সুকান্তর নামে। শ্রমিক পল্লির রেপ কেসটায়”।

-তারপর? পুলিশ তো শঙ্করের কথা শুনবে। আমার কথা শুনবে কেন?

-আহা। রাজনীতিটা কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে নাকি? তুমি কেন করতে যাবে। অন্য কাউকে দিয়ে করাও। তারপর প্রেসে চুলকে দেব না হয়।

তরুণ কিছুক্ষণ সুরজিতের দিকে তাকাল। বলল “আইডিয়াটা খারাপ না দাদা। তুমি ম্যানেজ করতে পারবে কেসটা?”

সুরজিত বা হাতটা তুলে দেখালেন। বললেন “এই হাতের খেল। এসব করে এতবছর সারভাইভ করতে হয়েছে হে। নইলে যে পার্টিতে ছিলাম সব এক সে বড় কর এক খেলোয়াড়। প্যান্ট হলুদ হয়ে যেত বুঝলে?”

ফোন এসছে। তন্ময় মাইতি। ভুরু কুচকাল তরুণের। স্টেট লেভেলের নেতারা আজকাল এই সব ছোট খাট ব্যাপারে খোঁজ রাখছে নাকি।

ফোন তুলল সে “হ্যালো”।

-তরুণ। কি খবর তোমাদের ওদিকে? খুব লাশ পড়ছে শুনছি। কি করছে কি তোমরা?

- না সেরকম কিছু না।

-কিছু না? পলাশ পাঁজা উড়ল, কালু উড়ল আর তুমি বলছ কিছু না? সি এম প্রচন্ড রেগে আছেন পাঠক পাড়া নিয়ে। তোমায় ক্লিয়ার কাট পনেরো দিন দেওয়া হয়েছে।যদি কেস সাল্টাতে পার ভাল নাহলে উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট অল্টারনেটিভ।

ফোন কেটে গেল ওদিক থেকে।

এসি ঘরে বসেও ঘামছিল তরুণ। সুরজিত বললেন “কি ব্যাপার?”

তরুণ মাথার পেছনে হাত রেখে বসল। বলল “আর কি? সি এম বলে দিয়েছে পনেরো দিনের মধ্যে না ঝামেলা না মেটাতে পারলে আমাকে আর লোকসভায় নমিনেশন দিতে হবে না”।

সুরজিতের মুখে এবার চিন্তাটা এল। বললেন “তরুণ, আমি যেটা বললাম সেটা তো করতেই হবে প্লাস এবার শঙ্কর ঘোড়ুই-এর কোন অ্যান্টি লবি আছে সেটা দেখ। নইলে খেয়ে নেবে তোমাকে ওরা। কেউ বাঁচাতে পারবে না। সুকান্তর নামে কালু আর পলাশ পাঁজার খুনের একটা কেস করে দাও। আমার কিছু প্রেসের ফিটিং ছেলে আছে।এই নিয়ে একটা হই চই বাঁধুক। হেডলাইন হোক, কে এই সুকান্ত বিশ্বাস। কি করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হল ওর? আমি দেখছি, অন্যদিক দিয়ে এবার সুকান্তকে পাঁকে ফেলতে হবে, মাঠে যখন নেমেছি ওয়াক ওভার দেব না”।

তরুণ চোখ ছোট করল। বলল “কালু আর পলাশ, এই দুজনকে কে ওড়াল?”

সুরজিত হাসলেন। বললেন “আউটসোর্সিং বোঝ? বাজারে আজকাল এই কথাটা খুব চলছে”।

তরুণ নড়ে চড়ে বসল। “তাহলে তো শঙ্কর হারামজাদাটা আছেই”।

নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুরজিত বললেন “না থাকলেই আশ্চর্য হতাম”।

-আমি কি ওকে একটা ফোন করব?

-না। ফোন করবে কেন?

-হেল্প চাই! বলি এখন কঠিন সময় একসাথে লড়ার সময়।

-হা হা হা। এ কি সিনেমা নাকি হে? তাছাড়া ও তো সেটাই চায়। তুমি ওর পায়ে গড়াগড়ি খাও।

-খেলাম! তাতে কি! এই সুকান্তর বাড়াবাড়িটা থেকে তো বাঁচতে হবে।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে সুরজিত বললেন “ধীরে চল।সময় আসতে দাও। শঙ্কর নিজেই লাথ মারবে সুকান্তকে”।

তরুণ মুখে একটা শব্দ করে বলল “সুকান্ত গেলে তো আরেকটা সমস্যা আছে!”

-কি?

-ভবতারিণীর থেকে পার্টি ফান্ডে যেটা আসত সেটা শঙ্কর পাবে। আমি...

সুরজিত বুঝতে চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা। “পার্টি ফান্ড মানে?”

-আরে সিকিউরিটি মানি। ভবতারিণী আমাদের গুডউইল ইউস করছে, সেটা কি মাগনায় হবে নাকি?

চোখ কপালে তুললেন সুরজিত "অ। তা সুকান্তকে তো তুমি ঢুকিয়েছিলে। ভবতারিণী দিয়ে কিছু কাঠি করা যাবে না ওর?"

তরুণ লাফিয়ে উঠল "এটা তো ভাবতেই পারি নি দাদা। তুমি সত্যিই গুরুদেব। পায়ের ধুলো দাও দাদা"।

সুরজিত চুপ করে গেলেন। তারপর তরুণের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বললেন "ধুলো নেবার সময় অনেক পাবে তরুণ। এখন অন্য কোন দিকে তাকিও না। খেলায় নাম। গোল কর নিজের গোল বাঁচিয়ে। তাতে তুমিও বাঁচবে। আমিও বাঁচব"।

২৬।

দীঘা ট্যুরটা কেমন গেল তার?

কেউ যদি এই প্রশ্ন তাকে করে সে জানে না কি উত্তর দেবে। অথচ যাবার কথা ছিল না তার। এক শনিবার হঠাৎই সকালে স্যার ফোন করে বললেন আর্জেন্ট কাজ আছে সেদিনই দীঘা যেতে হবে। সে যেন কিছু জামাকাপড় আর জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে অফিসে আসে, সেখান থেকেই দীঘা রওনা হবে তারা।

অফিসের কাজ সেরে যখন রওনা হল তখন দুপুর বারোটা বেজে গেছে। স্যার আসেননি অফিসে। এগারোটা নাগাদ ফোন করে বললেন রেডি হয়ে থাকতে।

গাড়িতে উঠে সে টের পেল সে আর স্যার ছাড়া আর কেউ যাবে না। খুশিই হল সে। প্রতিবার দু তিনজন থাকে। স্যারকে আলাদা করে পাওয়া যায় না।

তাছাড়া সে চমকেও গেছিল স্যারকে দেখে। স্যার পড়েছিলেন হলুদ রঙের টি শার্ট আর নেভি ব্লু কালারের জিন্স। এই ধরনের পোশাকে কোনদিন তমাল সেনকে দেখে নি সে। চিরকাল স্যুটে দেখে অভ্যস্ত ছিল। অনভ্যস্ত চোখ তাই স্বভাবতই চমকে গিয়েছিল।

আর কে বলবে মধ্য চল্লিশের লোক? দেখে রীতিমত যুবক বলে মনে হচ্ছিল তার। বলেও ফেলেছিল সে কথা। শুনে মৃদু হেসেছিলেন তমাল সেন।

ভবতারিণীর গেস্ট হাউসে তাদের ঢাউস গাড়িটা ঢুকল তখন ঘড়ির কাটা সাড়ে পাঁচটা পেরিয়ে গেছিল। সে পরিষ্কারই বুঝল তারা যে আসবে আগে থেকে খবর ছিল না। সবাই তটস্থ হয়ে পড়ল। তড়িঘড়ি স্যারের ঘরটা খুলে দেওয়া হল। স্যার বললেন তাকে ফ্রেশ হয়ে নিতে। ড্রেস চেঞ্জ করে তারা বেরিয়ে গেছিল মিটিংয়ে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেভেলে মিটিং ছিল। সে কিছুই করে নি। চুপচাপ মিনিটস নোট করে গেছিল নিজের ল্যাপিতে।

রাতে খাবার সময়ে হঠাৎ তমাল সেন তাকে কাঁচু মাচু মুখে জানালেন আগে থেকে জানানো হয় নি বলে আলাদা ঘর নেই। সে কি করবে? এক রুমে থাকতে পারবে নাকি আলাদা হোটেলে উঠবে তারা?

সায়নী একটু অবাক হয়ে গেছিল তমাল সেনের কথা শুনে। এ আবার কি কথা! এক রুমে কি করে থাকবে সে? তাছাড়া বিজনেস ট্রিপে আসবে, আগে থেকে না জানানোর কি ছিল। তাছাড়া এটা আগে জানা থাকলে মিটিং থেকে ফেরার সময়েই না হয় হোটেলের ব্যবস্থা করা যেত!

বেশ কিছুক্ষণ কাটা চামচ নিয়ে খেলার পর সে একটু থমকাল। সে তো আসলে তমাল সেনকে ভালবাসে। যে ভালবাসায় আবীরকেও সে হেলায় ভুলে যেতে পেরেছে। আজ যদি অ্যাক্সিডেন্টালি এক রুমে থাকতে হয় তাহলে সমস্যাটা কোথায়? তাছাড়া এতদিন সে তমাল সেনের সাথে ছিল। কত দিন এমনও হয়েছে মাঝ রাতে একা অফিসে। যদি কিছু অসভ্যতা করার ছিল তখনই দিব্যি করে ফেলতে পারতেন স্যার।

শক্ত হল সে। তমাল সেনের চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বলল “না স্যার, আমার কোন সমস্যা নেই এক ঘরে থাকতে”।

তমাল সেন মুখে কিছু না বললেও তার চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

#

তারা ঘরে ঢোকার পর ঘর বন্ধ করে অনেকক্ষণ স্নান করলেন স্যার। ঘরের দুদিকে দুটো ডবল বেড খাট। তার একটাতেই সে ঘুমাবার চেষ্টা করছিল। স্নান থেকে বেরিয়ে তমাল সেন তাকে বললেন জল দিয়েছে তো ছেলেগুলো?

সে উঠে দেখল জল নেই। ঘর থেকে বেরতেই একটা ছেলে ছুটে এল “দিদি কি চাই?”

সে জল বলতেই ছুটে দু বোতল জল এনে তার হাতে ধরিয়ে দিল ছেলেটা। সে বুঝল বসের সাথে আসলে কি

মজা। নিজেরা আসলে হয়ত নিজেদেরকেই জল তুলে বয়ে নিয়ে আসতে হত।

তার মনে পড়ে গেল ক্লাস টেনে একবার দীঘা এসেছিল। বাবা মাকে নিয়ে। বাবার অফিসের হলিডে হোম। তারা সমুদ্রে যাবে কি মার সারাদিন কেটে গেল রান্না করতে। রান্না করে আর গজগজ করে "ভেবেছিলাম বেড়াতে এসে যদি একটু শান্তি পাই। সে আর কপালে আছে। কথায় আছে না ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। আমার হয়েছে সে অবস্থা!"

মনে পড়ে গেল একবার দার্জিলিং গ্যাংটক যাওয়া ঠিক হয়ে, ট্রেনের টিকিট কেটেও ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল বাবার অফিস ফেরতা পুরো মাইনের টাকা পকেটমার হয়ে গেছিল বলে। সারা দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল সে। বাবার সে শূন্য চোখ সে কোনদিন ভুলবে না।

ঠিক করে ফেলল সে, ফিরে স্যারকে বলে ছুটি নিয়ে বাবা-মাকে নিয়ে সেই দার্জিলিং গ্যাংটকই বেড়াতে যাবে সে। কষ্টের দিন গিয়েছে। এবার ক'টা দিন না হয় সুখের দিন দেখুক বাবা মা।

ঘরে ঢুকে জল রেখে দেখল স্যার দাড়ি কামাচ্ছেন ঘরের মস্ত বেসিনটায়। কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে বসল "স্যার এত রাতে দাড়ি কাটছেন যে?"

দাড়ি কাটতে কাটতেই জবাব দিলেন স্যার "সময় পাই কোথায় বল?"

#

আফটার শেভ লোশনের সুগন্ধ আর একটা অদ্ভুত ভাললাগা কখন যে তাকে সে রাতটা ভাসিয়ে নিয়ে গেল সে জানে না। সে বাঁধা দেয় নি। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করেছিল স্যারের কাছে। সে রাতটা একটা সিঙ্গল খাটেই কাটিয়ে দিল তারা।

#

পরের দিন কলকাতার দিকে রওনা হলে হঠাৎ সায়নীর মনে পড়ে গেল মোবাইলটা অফ করা আছে।

অন করতেই এস এম এসটা এল। নম্বরটা এখন আর অচেনা নয়। তবু এখন বড্ড অপ্রাসঙ্গিক লাগছিল তার এই লেখাগুলি “sayani, tumi ki sotti amay bhule gele? tumi jano na ami tomai kotota miss korchi. please come back. please”.

সে সময় তমাল সেনের ডান হাতটা তাকে জড়িয়ে ধরে ছিল।বাইরে বৃষ্টির সাথে মিল রেখে গাড়িতে একটা গানও বাজছিল। কিছু একটা হিন্দি গান পুরনো দিনের “দিওয়ানা হুয়া বাদল” বা এই ধরনেরই কিছু...

27.

-কোথায়?

-এই তো বাড়িতেই শঙ্করদা।

-টিভি দেখেছ?

-না কেন বলুন তো?

-শ্রমিক পল্লির রেপটা নাকি তুমি করেছ। দুটো চ্যানেলে সারাক্ষন দেখাচ্ছে। কে এই সুকান্ত বিশ্বাস, কোত্থেকে এর উৎপত্তি, কোন কিছুই বাকি নেই। বলছে পাঠকপাড়ায় নাকি এখন কারও নিরাপত্তা নেই, দিনে দুপুরে মার্ডার হচ্ছে। তুমিই দায়ী।

নড়ে চড়ে বসল সুকান্ত।টিভিটা চালাল।দুটো চ্যানেলেই অ্যাড।তবে ব্রেকিং নিউজে পাঠক পাড়া আর সুকান্ত বিশ্বাস নামটা পড়া যাচ্ছে বটে। দীঘা থেকে ফেরার পরে মোবাইলে কয়েকটা আননোন নম্বর থেকে ফোন এসেছিল। কিন্তু সে কলব্যাক করে নি।

কিছুটা থমকে ফোনের ওপাশে শঙ্কর ঘোড়ুইকে বলল “আমার এখন কি করণীয়?”

-আমি খালি ভাবছি এত বুদ্ধি তরুণের নেই।

সে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল "আমি বুঝে গেছি এর পেছনে কে আছে"।

-কে?

-সুরজিত।

-হুম।আমারও তাই মনে হয়। তরুণের টুয়েলভ ফেল বুদ্ধিতে এত কুলোবার কথাও না। তুমি এখন বাড়িতেই তো?

-হ্যাঁ।

-আমি হাইকম্যান্ডের সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা বলি। দেখি কি ফিডব্যাক পাই। আর তরুণ, সুরজিতের ব্ল্যাক স্পট গুলি যত তাড়াতাড়ি ভেবে বের করে আমাকে জানাও। এখন ওপেন ওয়ার। হয় এস্পার নয় ওস্পার। মাঝে কিন্তু কিছু নেই।

-ভাবার দরকার নেই। আমি এখনই বলে দিচ্ছি। তরুণ ভবতারিণীর থেকে প্রতি মাসে কুড়ি হাজার টাকা নেয়। পাল পাড়ায় ওর একটা বাঁধা মেয়েছেলে আছে। নাম পম্পা। বয়স তিরিশের ওদিকে। বিধবা। আর সুরজিতের ব্যাপারে কি কিছু বলার দরকার আছে? সবই তো জানেন।

-কি করতে হবে বুঝছ কিছু?

বুঝল না সে। বলল "না দাদা কি করতে হবে"?

-আজ রাতের মধ্যে পম্পার লাশ ফেল। কাল সকালের মধ্যে এফ আই আর। আর টিভি চ্যানেল আমি দেখছি।

-কিন্তু তাহলে সমস্যাটা বাড়বে না তো?

-দূর। এত চাপ নেবার কিছু হয় নি। আর একটা কাজ পারবে করতে?

-কি দাদা?

-কাজটা কঠিন।

-বলুন। এখন আমার মাথা কাজ করছে না।

-সুরজিত যেন তরুণের সাথে যোগাযোগ না করতে পারে। কোথাও ফোন টোনও না করতে পারে। এটা পারবে?

-মানে মালটাকে তুলে গুম করে দিতে হবে তো?

-তাহলে সব থেকে ভাল।

-এ কাজটা আমি নিজের হাতে করব।

-আহ। তুমি হাইলাইট হবে কেন? এখন অত হুরুম তাড়ুম করে কাজ করার সময় না এটা বোঝ। বিশ্বস্ত কে আছে? একেবারে ঠাণ্ডা মাথার লোক? অপারেশনটা এমন ভাবে করতে হবে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

-গণেশ দের তো মেয়েটার ওখানে পাঠাব। সুরজিতকে তুলতে হলে...

-আরে কেসটা অন্যভাবে দেখ। বাড়ি থেকে একটা অন্য কোন জায়গায় ডেকে দেখ যদি কিছু করতে পার। ও গাড়ি টাড়িতে বেরোয় না?

-বেরলেও তিন চার জন থাকে। একা বেরোয় না।

-তবে? কি করে কি করা যাবে?

চিন্তিত শোনাল শঙ্করের কথা।

সুকান্ত বলল “আমার মনে হয় সুরজিতকে এখন কিছু করার দরকার নেই, খেলুক দাদা। ও খেলুক”।

-তুমি বুঝছ না। ও কিন্তু প্রচন্ড ধূর্ত। আমি তো ভাবতেই পারি নি শ্রমিক পল্লির রেপ কেসটায় ও তোমাকে জড়াতে পারবে। কত বুদ্ধি হলে এসব করা যায়।

-এতদিন ধরে তো ওরা এই করে এসছে দাদা।যাকে পছন্দ নয় তার নামেই কেস। এবার এই দলটাকেও শেষ করবে।

-করুক। আমি দেখছি অন্য কি ভাবে ব্যাপারটাকে থিতিয়ে দেওয়া যায়।

-আচ্ছা।

-আর দেখো সুরজিতের ব্যাপারে কনক্রিট কিছু ভাবনা এলে জানিও।

ফোনটা রাখলে সুকান্ত দেখতে পেল ঘরে নন্দিতা ঢুকেছে। মুখটা ভীত।

সোফায় বসে বলল “মা ফোন করেছে। খুব চিন্তা করছে তোমাকে নিয়ে”।

বিরক্ত হল সুকান্ত। এত চিন্তার মধ্যে আবার এই প্যানপ্যানানি।

কিছুটা ঝাঁঝিয়েই বলল “তোমার মা কে বল কোন সরকারি অফিসের কেরানীর সাথে তো মেয়ের বিয়ে দাওনি যে দশটা পাঁচটা ডিউটি করে বউকে ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে বেরবে বিকেলবেলা। সব জেনেশুনেই তো বিয়েটা দিয়েছিলে। তাহলে এখন এত নাকি কান্নার মানেটা কি?”

নন্দিতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুকান্ত বুঝল রাগ হয়েছে। কিন্তু যতবার সে টিভির ব্রেকিং নিউজ দেখছিল ততবার তার মাথাটা কাজ করছিল না।

সুরজিতকে তুললে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

এখন তো ঝিমলি আছে বাপের কাছে। কেমন হয় বাপ মেয়ে দুটোকেই তুলে একটা জায়গায় আটকে রাখলে?

অনেকদিন ঝিমলিকে দেখা হয় না তার। হঠাৎ বুকের চিনচিনে ব্যথাটা ফিরে এল।

সে কি আদৌ ঝিমলিকে ভুলতে পেরেছে?

#

বাড়ির নীচ থেকে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুকান্ত নীচে নামল। কুড়ি পচিশ জন লোক। এলাকারই লোক।

সে গম্ভীর গলাতেই জিজ্ঞেস করল “কি হয়েছে?”

ওদের মধ্যে মুরুব্বি গোছের একজন বলল “আমাদের এফ ডি ম্যাচিওরিটির একটা চেক পেয়েছিলাম কালকে।কাল জমা দিয়েছিলাম। আজ ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখছি চেকগুলি বাউন্স করেছে”।

সুকান্ত বিরক্ত হল। সকাল সকালে এত ঝামেলা। তার ওপর এ যেন বোঝার ওপর শাকের আঁটি। বলল “আচ্ছা, এ হয়ত কোন সমস্যা হয়েছে। এরকম তো হবার কথা নয়, আপনারা বরং কালকে আসুন আমি কথা বলে দেখছি হেড অফিসে”।

বুড়ো গোছের একজন বলল “কালকে হলে কি করে হবে? আমার ছেলে ব্যাঙ্গালোর যাবে আজ রাত্রে। টাকাটা আজকেই দরকার ছিল”।

সুকান্ত বলল “কত টাকা ছিল?”

-প্রায় সত্তর হাজার টাকা ম্যাচিওরিটির পরে।

-কি করবেন,এটা হয় ব্যাঙ্কের সমস্যা থাকে, অনেক সময় নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকে।আপনি ছেলের অ্যাকাউন্ট নাম্বার জেনে নিন। ওই অ্যাকাউন্টে না হয় কাল টাকাটা দিয়ে দেবেন। আপনারা আজ আসুন। আমি দেখছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা মিটিয়ে দেব।

লোকগুলি গজগজ করতে করতে চলে গেল। সুকান্ত শম্ভুকে ঝাড়ল “এই সব ঝামেলাগুলি নিজে ট্যাকল করতে পার না? আমাকেই যদি আসতে হয় তাহলে তোমাদের রাখা কি করতে?”

শম্ভু কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

সে ধমকাল “দাঁড়িয়ে না থেকে হেড অফিসে ফোন করে জান কি হয়েছে! যত্তসব!!!”

এর আগেও দুয়েকটা কেসে টাকা বাউন্স করেছিল। পরে হেড অফিসে জানালে চেক পালটিয়ে দিয়েছিল। এবারও নিশ্চয়ই সেরকমই কিছু হবে।

সে বেরনোর জন্য তৈরি হল। গণেশদের গ্রুপটাকে বোঝাতে হবে পম্পাকে কি করে ওড়াতে হবে।

তরুণটা বড্ড বাড় বেড়েছে। তার নাম চ্যানেলে দিয়েছে!

দেখ এবার তোর নামও খুব শিগগির হেডলাইনে আসছে।

28.

অফিসে আসার পর থেকেই সায়নী খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছে আজকাল। ব্যবসা যত বাড়ছে, অ্যাকাউন্টসের সব হিসেব তাকে বুঝে নিতে হচ্ছে। আহেলীদি আজকাল অসুস্থ বলে ক’দিন আসেনি। অনেকদিন পরে জয়েন

করেছে। এতদিন না আসার জন্য ওর কাজগুলিও তাকে দেখতে হয়েছে।

চোখ মুখ গুলি বসে গেছে আহেলীদির। সায়নী কাজের ফাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করে উঠতে পারেনি। শুনেছে প্রচন্ড শরীর খারাপ হয়েছিল নাকি।

বেশ কিছু চেক ফেরত এসেছে। বাউন্স করেছে নাকি। সে তড়িঘড়ি সেগুলি চেঞ্জ করার অর্ডার দিয়ে নিজের কেবিনে বসল। ইন্টারকমে তারপরে ধরল আহেলীদিকে।

-কি গো কেমন আছ?

-আরে ডার্লিং তুই একবারও এলি না সকাল থেকে আমায় দেখতে?

স্পষ্টতই অনুযোগের সুর।

সায়নী তড়িঘড়ি ছুটল আহেলীদির চেম্বারে। বয়স প্রায় ছত্রিশ বছর আহেলীদির। অসম্ভব সুন্দর ফিগার। ও না থাকলে সায়নীর অফিস বুঝতে অনেকদিন লেগে যেত। তাই অভিমান হলে ভাঙাতে তাকে যেতেই হবে।

তাকে দেখে হাসল আহেলীদি। বোঝাই যাচ্ছে ভাল রকম শরীর খারাপ থেকেই উঠেছে। সায়নী সরাসরিই জিজ্ঞেস করল “কি হয়েছিল গো তোমার? এত ভেঙে গেছে শরীর”?

আহেলীদি করুণ হাসল। বলল “জানিস না? অফিসে কিছু শুনিস নি? গসিপ?”

সায়নী অবাক হল একটু। আহেলীদিকে নিয়ে সেরকম কিছুই তো শোনা যায় না। অবশ্য যতক্ষণ অফিসে থাকে তাকে যে হারে দৌড়তে হয় তাতে লোকের সাথে গল্প গুজব করার টাইম পায় না। সেভাবেই বলল “নাহ... কেন?”

আহেলীদি হাসল। বলল “থাক তবে। বল তোর কি খবর?”

সায়নী বুঝল না ব্যাপারটা। বুঝল আহেলীদি কথা ঘোরাতে চাইছে। সেও আর বেশি জোরাজুরি করল না। বলল

“আর বোল না। দেখ না, সকাল থেকে বাউন্স চেক নিয়ে পড়ে আছি। কি ঝামেলা! কুড়িটা জায়গা থেকে এই সমস্যা শুরু হয়েছে”।

-ব্যাঙ্কে টাকা নেই?

-না দেখ না আছে, সমস্যাটা কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

-হয়ত ওই টাইমটায় টাকা তোলা হয়েছিল।

-নাহ। সেটা কি করে সম্ভব।

অবাক হল সায়নী।

আহেলীদি বলল “আসলে স্যারের কাছে ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস থাকে অ্যাকাউন্টের। হয়ত কোন কারণে ওখান থেকে টাকা তুলতে হয়েছিল”।

-স্যার এই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলবেন কেন?

-জানি না রে। আসলে কেন এরকম হয়, স্পেসিফিক্যালি বললে আমি কিছুই জানি না এ ব্যাপারে। আন্দাজে ঢিল ছুড়ে লাভ নেই।

হেসে উঠল আহেলীদি।

সায়নী হাসতে হাসতে বলল “ভবতারিণীতে ঢোকার আগে এই সব কিছুই জানতাম না। এখনও কতটা জানি নিজেই সন্দেহ হয়। ঢুকেছিলাম স্ক্রিপ্টে এখন আমি অ্যাকাউন্টসও দেখি ভাবো।”

আহেলীদি বলল “আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট। অথচ যে কাজ করছি একটা এম বি এরও বেশি। দাঁড়া একটা অসুধ খাই”।

সায়নী ব্যাগটা দেখে বলল “বাহ। ভারী সুন্দর ব্যাগ তো। কোথাকার?”

আহেলীদি ওষুধটা বের করল। বলল “তোর পছন্দ ব্যাগটা? নিবি?”

সায়নী হাসল “দূর কি যে বল। নিশ্চয়ই খুব দাম হবে”।

আহেলীদি বলল “কত আর বাইশ হাজার মত পড়েছিল”।

সায়নী চমকে বলল “সে কি গো? অনেক দাম তো?”

-তাতে কি? তোর পছন্দ কিনা বল।

সায়নী অপ্রস্তুত হল। এ যেরকম খেপেছে তাকে মনে হয় দিয়েই ছাড়বে। অথচ ব্যাগটার প্রশংসা সে অন্য কিছু ভেবে করে নি। এত দামী ব্যাগ নেবার প্রশ্নই আসে না। সে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। মাসের শেষে অনেকগুলি টাকা তার ব্যাঙ্কে ঢোকে, তাছাড়াও শপিং মলের গিফট ক্যুপন ইত্যাদি তো লেগেই আছে। তা সত্ত্বেও এত টাকা দিয়ে ব্যাগ কেনার কথা সে এখনও ভাবতে পারে না।

খানিকটা কথা ঘোরাবার জন্যই বলল “কিসের ওষুধ খেলে গো?”

আহেলীদি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকাল। পাঁচ সেকেন্ড মত কোন কথা বলল না। তারপরে স্বাভাবিকভাবেই ওষুধটা ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল “দীঘায় কি একই ঘরে ছিলিস? গেস্ট হাউসে ঘর ছিল না?”

সায়নী হতবাক হয়ে গেল। আহেলীদি এতসব কিছু জানল কি করে? তাছাড়া কাউকে বলা তো দূরের কথা এ ব্যাপারে কথা সে নিজের ছায়াকেও বলেনি সেদিনের পর থেকে। আহেলীদি জানল কি করে তবে?

সে মাথা নীচু করে বসে থাকল। কিছু বলল না।

আহেলীদি বলল “আমার কি হয়েছিল জানিস? অ্যাবর্ট করতে হয়েছিল। বাপ কে ছিল জানিস বাচ্চার?”

সায়নী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

আহেলীদি ব্যাগটা ডেস্কে রাখল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল “তমাল সেন”।

মাথাটা ঘুরে উঠল সায়নীর। তার মনে হচ্ছিল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

কোনরকমে বলতে পারল “কি?”

আহেলীদি বলল “তুই আসার আগে আমিই ছিলাম ওনার কাছের লোক। আজকে যেভাবে তুই রাত অবধি থাকিস, আমিও সেরকমই ছিলাম। অত্যন্ত ভদ্র। মার্জিত। কখনও অন্যায় সুযোগ নেয় নি। যা হয়। বরের সাথে ডিভোর্স অবধি চলে গেলাম। কখন যে প্রেমে পড়ে গেলাম বুঝতেই পারলাম না। তিনমাস আগে অফিস ট্যুরে ইটালি গেছিলাম। এই ব্যাগটা তমালই দিয়েছিল। স্বপ্নের মত কেটেছিল সে দিনগুলি। ফিরলাম।পিরিয়ড মিস হল। বুঝলাম প্রেগন্যান্ট। তারপর থেকেই দেখলাম সম্পর্ক কখন যেন শীতল হতে শুরু করল। তুই এলি। আমাকে বাইপাস করা শুরু হল। সবই বুঝতাম। আগে শুনতাম দাম্পত্য জীবন সুখের না। পরে শুনলাম একেবারে বাজে কথা, ওর দুটো বিয়ে। পশ এলাকায় দুটো আলাদা ফ্যামিলি থাকে। এক ছেলে মার্সিডিজ চালায় তো আরেক জন হারলে ডেভিসন। রেগে মেগে অ্যাবর্ট করতে গিয়ে বাঁধিয়ে বসলাম রোগ। অফিস এলেও হয় না এলেও হয়। কিন্তু কি করব বল, ডিভোর্সের মামলা চলছে। খোরপোষও পাচ্ছি না এখন। চালাতে তো হবে। মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে আসতেই হল”।

শেষ দিকটা গলাটা ধরে আসছিল আহেলীদির।

সায়নীর গা গুলোচ্ছিল।একই সাথে প্রচন্ড ঠান্ডা লাগছিল। বাথরুমে ঢুকে সাথে সাথেই বমি করে ফেলল। তার মনে হচ্ছিল একটা বড় স্বপ্নের বেলুন কেউ যেন জোর করে ফাটিয়ে দিয়েছে।

চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে এসে বসতেই আহেলীদি বলল “দীঘার ব্যাপারটা অফিসে অনেকেই জানে। তোর কানে আসেনি এটাতেই অবাক হলাম বরং”।

সায়নী কিছু বলল না। তারপরে বলল “গেস্ট হাউসে রুম না থাকার ব্যাপারটা তারমানে কমপ্লিটলি ফ্যাব্রিকেটেড?”

আহেলীদি চেয়ার ছেড়ে উঠল। তার পাশে এসে বসল। চুলে হাত রেখে আদর করে দিয়ে তাকে বলল "বিশ্বাস কর। আগে বুঝলে তোকে সাবধান করে দিতাম। ভেবেছিলাম তুই পারবি। কিন্তু ট্র্যাপে পড়লে যে আর মাথার বোধ বুদ্ধি কাজ করে না সেটা আমিও ভুলে গেছিলাম। তাছাড়া মাঝে মাঝে তলপেটে এত ব্যথা হত, আর কিছু বোঝার সময়ও পেতাম না"।

ফোনটা বাজছে। তমাল সেন। সায়নী ধরল না। স্ক্রিনে "সোনা" কথাটা যেন তাকে কুৎসিত বিদ্রুপ করে যাচ্ছিল।

29.

রাতের দিকে এদিকটা কেউ আসে না। একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বাড়িটা। সুকান্ত কয়েকবার এসেছিল প্রথম প্রথম। তরুণের বডিগার্ড হিসেবে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত। তখন সবে সবে ভবতারিণীতে ঢুকে একটা বাইক কিনেছিল।

রাত ন'টা নাগাদ আসত। চুপচাপ বেল টিপত। তারপরে ঢুকে যেত। সুকান্ত বাইকটা বাইরে রেখে পায়চারি করত। সময় হয়ে গেলে একটা পান চিবোতে চিবোতে তরুণ বেরিয়ে আসত। তাকে বলত "বুঝলি সুকান্ত বিয়ে করলাম না বলে জীবনটাকে নষ্ট করে লাভ নেই। একটু আধটু এসবও দরকার, তুই তো বিরহী মানুষ বুঝবি না এসব"।

গাড়ি করে আসেনি আজ সে। বাইকটা নিয়েই এসেছে। একটু দূরে রেখে চলে এল হাঁটতে হাঁটতে।

তখনকার মতই বেল টিপল। সাথে কেউ নেই। পকেটে একটা ছোট অটোমেটিক রিভলভার নিয়ে এসছে। চাইনিজ মাল। শঙ্করদা পাঠিয়েছে। শব্দও হয় না।

পম্পা মনে হয় রান্না করছিল। হাতে হলুদ লাগানো। সুকান্তকে দেখে অবাক হল খানিকটা। সুকান্ত বলল "তরুণদা পাঠিয়েছে। কিছু টাকা দিয়ে"।

ভেতরে ঢুকল সে। পম্পা দরজা বন্ধ করল। তাকে বলল "আপনি বসুন আমি হাতটা ধুয়ে আসি"।

সুকান্ত বসে চারদিক দেখছিল। মহিলা একাই থাকে। ছিমছাম বসার ঘর। টিভি আছে। একজন ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সী লোকের ছবি দেওয়ালে টাঙানো। বুঝল পম্পার হাসব্যান্ড।

পম্পার বিয়ের একটা ফটোও আছে। দুজনে হাসি হাসি মুখে ক্যামেরার দিকে তাকানো। কম বয়সে বেশ চটক ছিল। এখনও আছে।

দরজা খোলার পর থেকেই সুকান্ত একটা টান অনুভব করছিল। অদ্ভুত একটা যৌন আকর্ষণ আছে মেয়েটার। তরুণকে দোষ দিয়ে কি লাভ। মধ্য তিরিশেও টান টান ফিগার। মেদ নেই এক ফোটাও। ঠোটের উপরে আলগা ঘাম। গায়ের রং কাঁচা সোনার মত। এরকম মেয়ে থাকলে চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটার কোন কারণ নেই।

হাত ধুয়ে এসে বসল তার সামনে। বলল “বেশ কিছুদিন আসছেন না দাদা। কোন সমস্যা?”

সুকান্ত হাসল “সমস্যা প্রচুর আছে। লাস্ট কবে এসেছিলেন?”

পম্পা কপালের চুল সরাতে সরাতে বলল “আগের সপ্তাহে। তাও বার বার ফোন। খুব ব্যস্ত হয়ে গেছেন আজকাল। কত টাকা পাঠিয়েছে?”

সুকান্ত চোখ ছোট করল “এখানে আর কেউ আসে না?”

পম্পা বলল “দুয়েকজন আসত। ওর বন্ধুরা। মানে আমার হাজবেন্ডের। উনি তো সেটা ভাল চোখে দেখতেন না। তাই বারণ করে দিয়েছি”।

সুকান্ত বলল “আমার হাত দিয়ে তো এক হাজার টাকা পাঠিয়েছেন”।

পম্পা নিরাশ হল। বলল “আমি একটা ফোন করি? আমার তো আরও কিছু দরকার ছিল। মানে এত কমে কি করে?”

সুকান্ত উঠল। পম্পার পাশে গিয়ে বসল। পম্পা সেটা দেখল, কিছু বলল না। সুকান্ত বলল “আমি যদি? মানে আমি এখন কিছু টাকা দিতে পারি?”

পম্পা তার দিকে তাকাল। বলল “আগে তো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এখন কি কিছু রোজগার হচ্ছে? আমার রেট জানেন তো?”

সুকান্ত হাসল। পকেট থেকে একটা দশহাজার টাকার বান্ডিল বের করে রাখল সামনের টি টেবিলের ওপর। তারপর বলল “এতে দশ আছে। চলবে?”

পম্পা কিছুক্ষণ বড় বড় চোখ করে টাকাগুলি দেখল। তারপরে সন্দেহের গলায় বলল “এত টাকা আপনি কি করে পেলেন? ওনার টাকাটাই ঘুরিয়ে দিচ্ছেন না তো? আমি একটা ফোন করি আগে”।

সুকান্ত পম্পাকে জোর করে কোলে বসাল। ঘাড়ে গলায় চুমু খেতে খেতে বলল “বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর”।

#

বেশ কিছুক্ষণ পম্পার লাশটা দেখছিল সুকান্ত। এত সুন্দর ফিগার অনেকদিন দেখে নি সে। মরার পরেও নগ্ন শরীরটা সমান আকর্ষণীয় থেকে গেছে।

টেনে টেনে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে রাখল বডিটা।বালতি বালতি জল দিয়ে গোটা শরীরটা ধুয়ে দিয়ে ওখানেই লাশটা রেখে নিজের হাত ধুয়ে একটা রুমালে হাত জড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা ল্যান্ডলাইন থেকে তরুণের ফোনে বার কয়েক মিসড কল মারল।

চারদিক দেখে বেরিয়ে গেল ধীরে সুস্থে। কোথাও কেউ নেই। ল্যান্ড লাইনে তরুণ রিং ব্যাক করছে। ফোনটা আর্তনাদ করে করে কেটে যাচ্ছে। বাড়িটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে শঙ্করকে ফোন লাগাল “হ্যালো দাদা, অপারেশন সাক্সেসফুল”।

ওপাশ থেকে শঙ্করের চাপা গলা ভেসে এল “তরুণ কখন আসবে”?

সুকান্ত হিসেব করে বলল “এলাকাতেই আছে। এসে পড়বে নিশ্চয়ই আধঘণ্টার মধ্যে”।

ওপাশ থেকে শঙ্কর বলল “যদি ও নাও আসে, ওর লোকও আসে তাহলেও হবে”।

সুকান্ত গলা দৃঢ় করল “না দাদা। ওই আসবে, ১০০ভাগ ওই আসবে। এবার রাধা বাঁশি বাজিয়েছে। কৃষ্ণকে তো আসতেই হবে”। কথার শেষ লাইনগুলি শ্লেষ মিশিয়ে তারিয়ে তারিয়ে বলছিল সে।

-গুড। নব বাংলার দুটো রিপোর্টার যাবে। আর স্পেশাল ব্রাঞ্চ রেডি আছে। ও বাড়িটায় ঢুকলেই বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে হুজ্জতি শুরু করে দেবে। কজন লোক থাকবে তরুণের সাথে?

-বেশি না। ম্যাক্সিমাম এক জন। ওকে সাইড করে দিলেই চলবে।

সুকান্ত ফোন রাখল। খুনটা জীবনে দ্বিতীয়বার হল তার। আপসোস করে না সে। যখনই টিভিতে তার নাম দেখানো শুরু হয়েছে, তার আর মাথার ঠিক নেই। এখন একটা ঘোরের মধ্যে যাচ্ছে। পম্পার নরম শরীর তাকে অন্য এক ঘোরের মধ্যে নিয়ে গেছিল। রতিক্রিয়ার মাঝে পম্পাকে গুলি করার পর তার শরীরেই ঢলে পড়া শরীরটা মনে হচ্ছিল এখনও তাকে ছুঁয়ে আছে। সুকান্ত সিগারেট ধরাল একটা। পম্পার বাড়ির আসার আগে কিনেছিল। সাধারনত ছেড়ে দিয়েছিল অনেকদিন আগেই কিন্তু আজ দরকার পড়বে বলেই কিনে রেখেছিল। জোরে জোরে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল সে।

একটা বাইক দেখে সিগারেট নিভাল। তার পাঁচ মিনিট পরে একটা টাটা সুমো। সুকান্ত বুঝে গেল শঙ্কর ঘোড়ুইয়ের কাজ শুরু হয়েছে এবার। নিজের বাইকটা স্টার্ট দিল সে। বাড়ি গিয়ে এবার ভাল করে স্নান করতে হবে তাকে। নন্দিতা বোঝার আগে গায়ে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে নিতে হবে। আরেকটা জামা বাইকের ডিকিতে ছিল। চেঞ্জ করে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল সে। রক্তমাখা জামাটা ডিকিতেই রাখল আপাতত। পরে ফেলে দিলেই হবে।

30.

অনেকদিন পরে আবীরকে ফোন করল সায়নী। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর ফোনটা তুলল আবীর “হ্যালো”।

সায়নী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল এবার। আবীর ওপাশ থেকে অধৈর্য হল

“কথা বলছ না কেন?”

সায়নী বলল “কেমন আছ?”

-চলে যাচ্ছে। তুমি কেমন?

-খুব ভাল।

আবীর একটু থেমে বলল “তাতো হবেই। তুমি এখন সাকসেসফুল এত”। সায়নী ধরা গলায় বলল “তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ?”

আবীর একটু শ্লেষ মেশাল “ভুলতে তো হবেই। তুমি যখন সেটাই চাও। আমাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে নাকি? আমি আবার ওই সেন্টু খাওয়া টাইপ নই বুঝলে যে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় হুগলী সেতু থেকে ঝাঁপ টাপ মারব”।

-আমার সাথে দেখা করবে আবীর?

-কি হয়েছে তোমার? এনিথিং সিরিয়াস?

এবার আবীর একটু চমকাল।

-কোথায় দেখা করবে বল?

সায়নী বলল “আগে যেখানে করতাম। ভিক্টোরিয়ার সামনেটায়?”

-গাড়ি আনবে নাকি?আবার গাড়ির ভেতর চাটার প্ল্যান আছে?

-আমি সিরিয়াস আবীর। আমার কিছু কথা বলার আছে। আর আমি বাসেই আসব।

-আচ্ছা।

ফোনটা রেখে এসিটা বাড়িয়ে দিল সায়নী। কালকের রাতটা দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে। আহেলীদির সাথে কথা বলার পরে সোজা বাড়ি চলে এসেছিল। রাস্তা দিয়ে যখন হাটছিল কোন খেয়াল ছিল না। একটা বাস প্রায় চাপাই দিয়ে দিচ্ছিল তাকে। বাড়ি গিয়ে ঘর বন্ধ করে খুব কেঁদেছে। সে কল্পনাও করতে পারেনি তার জীবন নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলা হয়ে গেছে এর মধ্যে।

রাতে কিছু খেতে পারেনি। সকালেও খায়নি। দুপুরে সামান্য ভাত খেয়েছে ক্যান্টিনে। তার মনে হচ্ছিল অফিসের সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাকে নিয়ে কুৎসা করছে।

মোবাইলটা বাজছে আবার। তমাল সেন। এবার তুলল ফোনটা। ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন গলা ভেসে এল “কি হল সায়নী? কালকে ছিলে না, ফোন সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছিলে? ইজ এভরিথিং অলরাইট?”

সায়নী স্বাভাবিক গলাতেই বলল “হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে তো সব”।

-তুমি একবার আমার চেম্বারে আস তো।

চমকাল সে কিছুটা।এত সকাল সকাল তো তমাল সেন অফিসে আসে না। কি হল তবে।

#

তমাল সেনের চেম্বারটা বিরাট। ঝকঝক করছে সব কিছু। ল্যাপটপ, প্লাজমা টিভি, সব কিছু আছে।দেওয়ালে

রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরাট বিরাট পোস্টার। কোনটাতে তাদের পাশে তমাল সেন কোনটাতে তারা তমাল সেনের কানে কানে কিছু বলছে। সায়নী চুপচাপ গিয়ে বসল সামনে।

তাকে দেখে উঠে এল চেয়ার থেকে। তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল "সায়নী আই হ্যাভ আ গ্রেট নিউজ ফর ইউ। আমি আর তুমি ফ্রান্স যাচ্ছি নেক্সট মান্থ।তোমার পাসপোর্ট আছে তো?"

সায়নী পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে থাকল। তমাল সেনের হাতটা ধীরে ধীরে পিঠ থেকে সরিয়ে বলল "তারপরে আহেলীদির মত আমাকেও প্রেগন্যান্ট করে ছেড়ে দেবেন?"

তমাল সেন ছিটকে গেল।

চোখ বড় করে তার দিকে তাকিয়ে বলল "ওই বিচটা তোমাকে এসব বলেছে? তুমি জান না ওর হাসব্যান্ড ওকে ছেড়ে দিয়েছে? ওর মাথা খারাপ অবস্থা। মাঝ রাতে আমাকে ফোন করে করে বিরক্ত করত বলে আমি এখন আর ফোন ধরি না। তুমি ওর কথা শুনে। ছি ছি..."

সায়নী তবু থামল না "আর আপনার যে দুটো বিয়ে। সে তো বলেননি কোনদিন? আমি জানতাম আপনার স্ত্রীর সাথে রিলেশনশিপ ভালো নেই, সেপারেশনে আছেন। কই সেটা বলেননি কেন?"

তমাল সেন সিগারেট ধরাল একটা। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "এটাও নিশ্চয়ই আহেলীই বলেছে? ও একটা সাইকো কেস এখন সায়নী। ওর বর ওর ক্যারেক্টার নিয়ে ডিভোর্সের মামলা করেছে। কার সাথে শোয়নি ও। তুমি জান আউট স্টেশন ক্লায়েন্টদের ও জোর করে গিয়ে মিট করত শুধুমাত্র ওদের সাথে শোয়ার ধান্ধায়?আই অ্যাম কাইন্ড এনাফ যে ওকে এখনও লাথ মেরে বের করে দিইনি। আমার একটাই বিয়ে অ্যান্ড উই আর সেপারেটেড দশ বছর আগে থেকে। আমার দুই ছেলে। তাদের জন্য কেন করব না বল, আফটার অল আমিও তো বাবা"?

সায়নী ক্লিন বোল্ড হয়ে গেল। কেঁদে ফেলল "আমি জানি না আমি কি করব কিন্তু আমার কিছু ভাল লাগছে না"।

তমাল সেন তাকে দুহাত ধরে চেয়ার থেকে তুলল। ঠোঁটে একটা গভীর চুমু দিয়ে বলল "আই লাভ ইউ সায়নী আর আমি তোমার সাথে সিরিয়াসলি একসাথে সারাজীবন কাটাতে চাই। তুমি বিশ্বাস কর আমায় প্লিজ"।

দামী বিদেশী সিগারেটের গন্ধ সায়নীকে সম্মোহিত করে ফেলল। সেও বলল "কবে থেকে থাকবে আমায় নিয়ে?"

তমাল সেন তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল "আজ থেকে? কোন আপত্তি আছে?"

সায়নী চুপচাপ বসে পড়ল আবার। ধরা গলায় বলল "আজ আমায় যে একটু বেরতে হত। একজনের সাথে দেখা করার কথা ছিল"।

তমাল সেন তার থুতনিটা ধরে নিজের দিকে ফেরাল। বলল "প্রাক্তন প্রেমিক নাকি?"

চমকালেও মচকাল না সায়নী। বলল "না কলেজের পুরনো এক বন্ধু।"

-ভাড় যে যায়ে তোমার কলেজের বন্ধু। আজ শুধু তুমি আর আমি। চল।

-কোথায়?

-চল। আর বাড়িতে বলে দাও আজ ফিরবে না অফিসে আটকে গেছ।

#

তমাল সেনের সাথে তার গলফ গ্রীনের বিরাট বাড়িতে সারারাত জেগে কাটাল সায়নী। সে ভুলেই গেছিল কালরাতের কথা। আবীরের ফোন আর ধরে নি সে। শরীরী ভালবাসা তাকে সব ভুলিয়ে পরম সুখে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

#

শুধু সে জানতে পারল না দক্ষিণ কলকাতার কোনও এক পুকুরের পাশে আহেলী গাঙ্গুলি বলে একজনের লাশ পাওয়া গেছে। কে বা কারা তাকে অফিস থেকে ফেরার পথে গুলি করে খুন করেছে।

৩১।

একটা মেয়ে দেখা হয়েছে গ্রামের দিকের। বিল্টুর বেশ পছন্দ হয়েছে। মেয়েটা টুয়েলভ পাশ হলেও দেখতে শুনতে ভাল। ভাল রান্নাও জানে। বিল্টু জানিয়েও দিয়েছে বাবা মা কে যে এই মেয়ে তার পছন্দ হয়েছে। এখন কুষ্ঠী দেখা হচ্ছে দুজনের। সব ঠিক ঠাক চললে বিল্টুর ইচ্ছা আছে দু তিন মাসের মধ্যে বিয়েটা করে নেবার। মেঘে মেঘে ভালই বয়স হয়ে গেছে। এখন না করলে আর কবে করবে।

আজকাল কাজের চাপ বেশ বেড়েছে। সাইটে সকালটা থেকে বিকেলের দিকে অফিসে এসে বসতে হয়। টাকার হিসেব তাকেই করতে হচ্ছে আজকাল। মাইনেটাও এক লাফে বেড়েছে।

সাইট থেকে ফিরে অফিসে ঢুকতে গিয়ে দেখল বেশ বড় একটা লাইন হয়ে গেছে। বিরক্ত হল সে। ইদানীং ভবতারিণীর ব্যবসা যত বাড়ছে তার বাড়ি যেতে তত রাত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ভবতারিণীর কাগজে বিজ্ঞাপনের অফিসও তাকে তদারকি করতে হয়। সরকারি অফিস হলে সব কাজের জন্য আলাদা আলাদা লোক থাকত, এখানে শম্ভু, পলাশ আর তাকেই সব দেখতে হয়।

অফিসে ঢুকতে দেখল কয়েকজন লোক উচ্চস্বরে গালিগালাজ করছে। তাদের পাড়ারও দুয়েকটা ছেলে আছে। তাকে দেখে সবাই তার দিকেই এল।

বাজারে পলটুর চায়ের দোকান। দিনে দশটাকা করে জমা রাখে তাদের কাছে। আগে পোস্ট অফিসে রাখত। তার কথায় ভবতারিণীতে রাখছে। তাকে দেখে তেড়ে এল "কিরে বিল্টু চিটিংবাজি শুরু করলি কবে থেকে?"

বিল্টু খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেল। তারপরে বলল, "কেন, কি হয়েছে?"

পল্টু একইরকম আক্রমণাত্মক ভাবে বলল "আমার এখন প্রায় দশহাজার টাকা হয়েছে। টাকাটা তুলতে এলাম। সাতদিন ধরে ঘোরাচ্ছে। আজ আসুন কাল আসুন। যখন পলিসি করেছিলাম তুই কি বলেছিলি? যেদিন দরকার, এই পলিসি ম্যাচিওরের দিনই টাকাটা পাওয়া যাবে। এবার তো দেখছি ঘুরিয়েই যাচ্ছে। আদৌ কি টাকা দেবার ইচ্ছা আছে তোদের? না সবটাই মেরে দিলি?"

বিল্টুর রাগ চড়ে গেল মাথায়। আজ অব্দি তাকে এভাবে কেউ কথা বলতে পারেনি। সে তেড়ে গেল "ফালতু কথা বলবে না একেবারে। আমি কেন তোমার টাকা মারতে যাব। তোমার টাকায় আমি পেচ্ছাপ করি"।

সবাই হই হই করে তেড়ে এল। একটা ঝামেলার সৃষ্টি হল। শম্ভু চেষ্টা করল পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করতে।

বিল্টুকে ছাড়িয়ে নিল। তারপরে ওদের উদ্দেশ্যে বলল "আচ্ছা আপনাদের কে বলেছে বলুন তো আপনাদের টাকা আমরা মেরে দিলাম, কলকাতায় অফিস, আমাদের কাগজপত্র যেতে আসতে একটু তো টাইম লাগবে। এমন অধৈর্য হলে কি করে হবে?"

পল্টু সহ বাকি বিক্ষোভকারীরা কিছুটা শান্ত হল এ কথা শুনে। একজন বলল "আমার কিন্তু একমাসের ওপর হয়ে গেছে। এখনও টাকাটা আসে নি"।

শম্ভু বোঝানোর চেষ্টা করল "কেউ মারবে না আপনাদের টাকা। আপনারা তো জানেন আমাদের সরকারের অনেকেই আমাদের কোম্পানির সাথে যুক্ত। টাকা মারা অত সহজ নাকি?"

সবাই শাসিয়ে বেরিয়ে গেল। পল্টু যাবার সময় বলে গেল "আমি ওসব জানি না, যদি টাকা না পেয়েছি, আমাদের কষ্টের টাকা, দিনের পর দিন খেটে রোজগার করা টাকা, হারামের টাকা না, বুঝে নেব"।

বিল্টু আবার তেড়ে যেতে যাচ্ছিল। শম্ভু আটকে দিল।

ঘর খালি হয়ে গেলে বিল্টু জোরে জোরে শ্বাস ছাড়ছিল। শম্ভু তার দিকে জলের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল " হেড অফিস এত গরম কেন তোর? এ তো রোজকার ঝামেলা? এরকম হতেই পারে। এত চাপ নিয়ে নিস কেন?"

বিল্টু ফুঁসতে ফুঁসতেই বলল "আজ অবধি কেউ আমার সততা নিয়ে কোন প্রশ্ন করে নি। পল্টুর বোঝা উচিত আমি যে বাড়ির ছেলে তারা কখনও চিটিংবাজ হতে পারে না"।

শম্ভু তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল "আরে! এইসব চামার চুমোর দের কথা মনে নিতে হয় নাকি! এসব মাল হচ্ছে কাস্টমার। ওইভাবেই থাকে।শালা চা বানায়, কেউ মেথর, এরা কে কি বলল তা নিয়ে তুই লাফাচ্ছিস"।

বিল্টু বলল "তা হোক। তুমি হেড অফিসে ফোন কর। এসব কি হচ্ছে। টাকা লোককে টাইমে দেবে না কেন? তার জন্য আমরা কেন সাফার করব?"

শম্ভু ক্লান্তভাবে বসল। বলল “আর বলিস না, গত ক’দিন এই তো চলছে। আর পারছি না। এত বড় কোম্পানি। সব জায়গায় জমি বাড়ি কিনে বেড়াচ্ছে, চ্যানেল চালাচ্ছে অথচ এই ব্যাপারগুলোয় এত গাফিলতি কেন কে জানে!”

কথা বলতে বলতে বিল্টুর ফোনে একটা ফোন এল। সুকান্ত। সে ধরতেই ওপাশ থেকে সুকান্তর গলা পাওয়া গেল “কোথায়?”

বিল্টু বলল “এই তো তোমার বাড়ির নীচের তলায়। অফিসে”।

-ওকে। আমি আসছি।

সে শম্ভুকে বলল “সুকান্ত আসছে।ওকে বল এসব কি শুরু হয়েছে। হেড অফিসের সাথে কথা বলতে বল”।

শম্ভু বলল “হ্যাঁ বলব। কিন্তু তুই মাথা ঠাণ্ডা কর”।

সুকান্তকে দেখে কিছুটা চমকাল দুজনেই। শরীর খারাপ মনে হচ্ছে। বিল্টু বলল “জ্বর নাকি?”

সুকান্ত বলল “না, ঠান্ডা লেগেছে একটু”। তারপর শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বলল “আজকেও বাওয়াল বেঁধেছিল?”

শম্ভু মাথা নাড়ল “হ্যাঁ, এতো এখন রোজের গল্প। হেড অফিসে কথা বল। এতো কোনদিন মার ধোর খেয়ে যাব যে কোন দিন”।

সুকান্তর চোখটা জ্বলে উঠল “কোন শালা মারবে?”

বিল্টু সুকান্তকে দেখে ভয় পেল। কেমন বেপরোয়া লাগছে। সে কথা ঘোরাল বাধ্য হয়ে “আমাকে খুঁজছিলে কেন?”

সুকান্ত তার দিকে চেয়ে বলল “কলকাতা যেতে হবে”।

বিল্টু বলল “হেড অফিস?”

-না। আমার শ্বশুরবাড়ি। আমার বউকে আনতে হবে।

অবাক হল বিল্টু। “তুমি যাবে না আনতে?”

সুকান্ত মোবাইল বের করল। নম্বর ডায়াল করতে করতে বলল “নাহ, কিছু কাজ পড়ে গেছে”।

বিল্টু বলল “ঠিক আছে”।

সুকান্ত তার দিকে তাকিয়ে বলল “যাওয়ার আগে ভবতারিণীর হেড অফিস হয়ে যাবে। টাকা আনবে। আমি বলে দিচ্ছি। চেকের গণ্ডগোল যা চলছে তাতে ক্যাশেই কাজ চালাতে হবে”।

বিল্টু ভয় পেল “একা আমি অতগুলি টাকা আনব?”

-না না। তুমি বলে দেবে। কিছুক্ষণ পরে শম্ভু যাবে গণেশদের নিয়ে। ওই টাকাটা আনবে। তুমি খালি ওদের অফিসে গিয়ে রসিদটা সই করে এস।

স্বস্তি পেল বিল্টু। “ঠিক আছে।আমি কি এখনই বেরিয়ে যাব?”

“হ্যাঁ যাও, বলাইকে নিয়ে যাও”।

সে বেরতে যাচ্ছিল সুকান্ত আবার ডাকল “আর শোন, গিয়ে বলবে আমি পাঠিয়েছি, আর এই নাও কিছু টাকা রাখ, মিষ্টি নিয়ে যেও”।

বিল্টু টাকা নিল, সুকান্ত যোগ করল “ঝগড়া কেস। নাও আসতে পারে। সেরকম হলে ফোন কোর আমায়”।

বিল্টু বিরক্ত হল। এই সব ঘরোয়া ঝামেলাগুলি যে কেন তার ওপর আসে কে জানে!

৩২।

ঘুমের মধ্যে বিষ্ণু, পম্পা, খোকনরা হানা দেওয়া শুরু করেছে সুকান্তর। রাতের ঘুম মাথায় উঠেছে। নন্দিতা ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। বড় খাটটায় রাতে শুতে অসহ্য লাগছে। চোখ বন্ধ করলেই কখনও পম্পার রক্তমাখা শরীর, কখনও বিষ্ণুর পানের ছোপ খাওয়া দাঁত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মাঝরাত অবধি জেগে থেকে টিভি দেখে, বই পড়েও কোন লাভ হচ্ছে না। শেষ মেষ না থাকতে পেরে রাত তিনটেয় ফোন করে বসল নন্দিতাকে। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর কঠিন গলায় নন্দিতা জিজ্ঞেস করল "কি হয়েছে এত রাতে কি?"

সুকান্ত হাঁটু গেড়ে বসার গলায় বলল "প্লিজ চলে আস আমি আর পারছি না, রাতে ঘুম হচ্ছে না"।

নন্দিতা ফোন কেটে দিল। তাই পরের দিন বিল্টুকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল সে।

তরুণের ঘটনাটা দুটো চ্যানেলে সারাদিন দেখাচ্ছে। কিন্তু অস্বস্তিটা এখনও যায় নি। সুরজিত শিকদারের চেনা চ্যানেলে তাকে নিয়েও দেখাচ্ছে। কিন্তু তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। সুকান্ত যেহেতু সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত নয় তাই সে কিছুটা ছাড় পেয়েছে।

ঘটনার তিন দিন কেটে গেছে। এখনও কেউ গ্রেফতার হয় নি। তরুণকে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গেছে। পুলিশ মুখ বুজে আছে।

সুকান্ত শঙ্করকে ফোন করল।

ফোন ধরে শঙ্কর বলল "বল"।

-দাদা, কোন খবর?

-খবর ভাল আছে। যেখানে যা খবর দেবার দিয়েছি। আজ কালকের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা পাঠকপাড়ার সন্ত্রাস আর

ধর্ষণের বিরুদ্ধে মিছিল করবে কলকাতায়। সি এমও বেশ রেগে আছেন তরুণের ওপরে।

-কিন্তু গ্রেফতার হচ্ছে না যে?

-সব হবে, তুমি চুপচাপ থাকো এখন। আমি যা করার করছি।

গলাটা উল্লসিত শোনাচ্ছিল শঙ্করের।

সুকান্ত বলল "এদিকে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে দাদা"।

-কি?

-ভবতারিণী ম্যাচিওরিটির টাকাগুলি দিতে বড্ড দেরী করছে। প্রায়ই ঝামেলা লাগছে।

-আরে এটা একটু ম্যানেজ করে নাও। এটা কোন সমস্যা হল? ঠিক আছে আমি তমাল সেনের সাথে কথা বলে নিচ্ছি।

-আচ্ছা। তরুণকে যেদিন জেলে পাঠাবে স্পেশাল পার্টি দেব।

-হা হা। ওই শুয়োরটাকে উপড়ে দিতে ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে। কিন্তু সবাই বুঝবে এটা আমার কাজ। শুধু এই জন্য করছি না।

-মনে হলে বলবে। উপড়ে দেব।

-আরেকটা খবর শুনলাম।

-কি?

-তরুণের পরে পার্টি হাইকম্যান্ডের দ্বিতীয় পছন্দ সুরজিত।

চমকাল সুকান্ত। “সে কি?”

-হ্যাঁ। স্ট্রং লবি ধরেছে। তাছাড়া তোমার ইমেজটা মিডিয়ায় খারাপ করে আসলে ওই সুবিধাটা নিতে চাইছে।

ক্লান্ত গলায় সুকান্ত বলল “ব্যাপারটা বাঘে সিংহে মারপিট করে মরল শেয়াল হরিণের মাংস খেল সেরকম হয়ে গেল না দাদা?তাছাড়া যার জন্য পার্টি ছাড়লাম সেই লোকই তো তাহলে এখানে মাথায় চলে আসবে। লাভ কি হল বলুন তো! ”

শঙ্কর হাসল “অত সোজা নাকি? ডাল বদলে এসে সোজা এম পি?শঙ্কর ঘোড়ুই বেঁচে থাকতে সেটা হতে দেবে না। সেরকম হলে কোন বুদ্ধিজীবীর নাম প্রপোজ করে দেব। আমার মত ছাড়া হবার চান্স কম”।

বিরক্ত লাগছিল সুকান্তর। আর কোন কথা বলল না।

#

ফোনটা রেখে সে বেরল। বাড়িতে থাকতে অসহ্য লাগছে। সন্ধ্যেবেলা হলে আজকাল রাস্তায় লোকজন কমে যায়। কয়েকটা ঘটনার পর পাঠকপাড়ায় এখন শ্মশানের শান্তি। স্কোডা কিনেছে একটা। নিজেই চালিয়ে বেরল। সুরজিতের বাড়ির সামনে দেখতে পেল ঝিমলির বরের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। তারমানে ঝিমলি এসছে।

তিনরাত্রি ঘুম হয়নি। চোখ লাল হয়ে গেছে। মাথা দপদপ করছে। সুকান্তর ওপরে হঠাৎ যেন ভূতে ভর করল। গাড়িটা নিয়ে বেশ জোরে সটান ঝিমলির গাড়িটায় ধাক্কা মারল। বিরাট জোরে একটা শব্দ হল। পায়ে কোমরের কাছে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল।

শব্দ শুনে সুরজিত বেরিয়ে এলেন। পাড়ার লোকজনও। তাকে ধরে সুরজিতের বাড়িতে ঢোকানো হল। সুকান্ত দাঁড়াতে পারছিল না। একটা খাটে শোয়ান হল তাকে।

ঝিমলি উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিন পরে কিছুটা শান্তি পেল সে। চোখ বন্ধ করে থাকল। সুরজিতের গলা শুনতে পেল “সকাল সকাল কি মাল টাল খেয়ে আছিস নাকি রে?”

সুকান্ত তাকাল সুরজিতের দিকে। বুড়ো হয়েছে মালটা। ওর মুখে একটা থুতু দেবার প্রবল ইচ্ছা দমন করে হাসি মুখে বলল “না ব্রেকটা হঠাৎ ফেল করল”।

ফোনটা বাজছে। ডান হাতে অসম্ভব ব্যথা করছিল, তবুও বুকপকেট থেকে ফোনটা বের করল সে। নন্দিতা। সে “হ্যালো” বলল।

ওপাশ থেকে নন্দিতার বিরক্তিভেজা গলা ভেসে এল “ভাড়াটে সৈন্য পাঠিয়েছ কেন? নিজে আসতে পার না?”

যন্ত্রণা হচ্ছিল প্রচুর। তবু স্বাভাবিক গলা বজায় রেখে ঘরভর্তি লোকের সামনেই বলল “আমি ভাল নেই। নন্দিতা প্লিজ আস”।

ঝিমলি শুনছিল তার কথা। সুকান্ত এই কথাটা বলে ওর দিকে তাকাল। ঝিমলি চোখ ফিরিয়ে নিল।

নন্দিতা বলল “আমি যাব না। পারলে নিজে আস। নইলে আমি যাব না”।

ফোনটা কেটে গেল।

সুরজিতও শুনছিলেন। বললেন “কি হয়েছে তোর? ভাল নেই কেন?”

উত্তর দিতে ইচ্ছে করল না সুকান্তর। শম্ভুকে ফোন করল।

“শম্ভু একটা গাড়ি পাঠা সুরজিত শিকদারের বাড়িতে। আমাকে এখনি কলকাতা যেতে হবে। তোরা কোথায়?”

“উল্টোডাঙা পৌঁছে গেছি দাদা। আচ্ছা আমি দেখছি গাড়ির ব্যবস্থা করছি, তুমি ওখানে কি করছ?” অবাক গলায় বলল শম্ভু।

“পরে বলব। তুই গাড়িটা পাঠা। যত তাড়াতাড়ি পারিস”।

ফোন কাটতে ঝিমলি বলল “এই অবস্থায় তোমার এখন হাসপাতাল যাওয়া উচিত। কলকাতা যাবে কি করে?”

ঘরভর্তি লোকের সামনে ঝিমলির চোখে চোখ রেখে সে বলল “ভালবাসার জন্য শরীরটা ফ্যাক্টর না ঝিমলি। সাহসটা ফ্যাক্টর”।

#

মাঝরাতে নন্দিতার বাড়ির দরজায় বেল বাজিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সেই সময়েই তার মোবাইলে একটা এস এম এস এল শঙ্কর ঘোড়ুইয়ের যেটা সে পড়তে পারল না “bhabatarini dubbe samnei. joto taratari paro tomar ja taka poisa ache ber kore nao. urgent! ar kauke kichu bolar darkar nei”.

33.

অফিস যেতে বারণ করল তমাল সেন। সায়নীও ঠিক করল যাবে না। এমনিতেই সারারাত জুড়ে একফোঁটাও ঘুম হয় নি। শরীরের প্রয়োজনীয়তা ফুরোতে ঘুম পাচ্ছিল, তারপরে আবার জেগে উঠছিল শরীর।সে দুপুর বারোটা অবধি ঘুমোল। উঠে দেখল তমাল সেন বিছানায় নেই। ফোনটা অন করে দেখতে পেল আবীর অনেকগুলি এস এম এস পাঠিয়েছে। ইগনোর করল। স্যারের ভালবাসা তাকে আগেও আবীরকে ভুলিয়েছিল, এবারেও ভুলাবে।

বাড়িতে একটা ফোন করল। উদ্বিগ্ন স্বরে মা জিজ্ঞেস করল “কিরে খেয়েছিস তো? সব ঠিকঠাক আছে তো?”

সে আশ্বস্ত করে ফোন রাখল।বিরাট বাড়িটায় কোন চাকর বাকর নেই। সে একা একা ঘুরল। বেশিরভাগ ঘরই তালা দেওয়া। কোন কোনটা খোলা। বেশি আসবাব কোনটাতেই নেই। কোন ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র নেই। সে অনেকদিন পরে ভাল করে স্নান করল। রোজই অফিস যাবার তাড়া থাকে। রবিবারগুলি বাড়ির কাজে কেটে যায়। শোয়ার ঘরে বেশ কিছু টিশার্ট আর হাফ প্যান্ট ছিল তমাল সেনের স্নান করে সেগুলিই পড়ল।

ফোন এল স্নানের পরেই। ওপাশ থেকে স্যারের গলা ভেসে এল “সোনা, তুমি রেডি হয়ে থাক আমি এখনি আসছি, একসাথে লাঞ্চ করব”।

সে আমতা আমতা করল “আমি তো কোন জামা কাপড় আনি নি”।

-ওহ, সরি, আচ্ছা লাঞ্চ করে বেরব, আমি আসছি কথা আছে।

ফোনটা রেখে টিভি দেখতে দেখতে তমাল সেন চলে এল। তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলল “আমাদের এখনি বেরতে হবে সায়নী”।

সায়নী অবাক হল “কোথায়?”

-আপাতত বেনারস। তারপরে দিল্লি।

আকাশ থেকে পড়ল সে। “সেকি, আমার তো কিছুই গোছগাছ করা হয়নি”।

তমাল সেন তার দিকে চেয়ে বলল “খুব জরুরি অফিস ট্যুর। তোমার বাড়ি হয়ে গেলে কতক্ষণ লাগবে গোছগাছ করতে”?

সে ভেবে নিয়ে বলল “আধঘণ্টা”।

খুশি হল তমাল সেন “বেশ তো। তা দুপুরে কি লাঞ্চ করবে? বিরিয়ানি?”

সে হাসল।

#

অশোক সেন সাহেবের গাড়ি চালাচ্ছে প্রায় আড়াই বছর। দিলদার লোক।মাইনে ছাড়াও টিপস লেগেই আছে। তাছাড়া স্যারের জরুরি সব জিনিসপত্র সেই দেখাশোনা করে। অশোক জানে সে যে কাজ করে তাতে প্রশ্ন বেশি করা যাবে না। বড়লোকদের বড় বড় ব্যাপার। সেন সাহেব যে মেয়েগুলিকে গাড়িতে তোলেন তাদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু ফেলার উপায় থাকে না তার।

এর আগে আহেলী মেম সাহেব ছিল। গাড়ির মধ্যেই সাহেবের কাজ কম্মো শুরু হয়ে যেত। লুকিং গ্লাস দিয়ে সবই দেখে সে কিন্তু জানে, বোবার শত্রু নেই। তাই চুপচাপ দেখে নেয়। দেখেশুনে বেশি গা গরম হলে সোনাগাছি চলে যায়।

সকাল আটটায় সাহেব তাকে ফোন করে বলল বেনারস যেতে হবে। সে সেইভাবে তৈরি হয়ে এসে স্যারকে নিয়ে বেরল। হেড অফিস থেকে দুটো ব্যাগ ডিকিতে তুলে ফিরে দেখল সাহেবের বাড়িতে সায়নী ম্যাডাম আছে। যা বোঝার বুঝে নিল। কিন্তু চুপ চাপ গাড়ি হাকাল স্যারের কথা মত।প্রথমে আরসালানে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে সায়নী ম্যাডামের বাড়ি আধঘন্টা পয়তাল্লিশ দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় হুগলী সেতু পেরিয়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে যখন ধরল তখন বিকেল পাঁচটা।

সায়নীর ফোনটা মুহুর্মুহু বেজে যাচ্ছিল।সে ধরছিল না। আবীর বড় বিরক্ত করছে। ভাইব্রেশন মোডেরও একটা বিরক্তিকর শব্দ আছে। একসময় গাড়ি সিঙ্গুরের রাস্তায় উঠলে তমাল সেন হঠাৎ সায়নীর দিকে ফিরে বলল "ফোনটা অফ করে দাও সোনা"।

সায়নী সেটা করবে আগেই ভাবছিল তবু ফোনটা অফ করতে করতে জিজ্ঞেস করে ফেলল "কেন?"

তমাল সেন তাকে জড়িয়ে আঙুল দিয়ে তার বুকে একটা টোকা মেরে বলল "দুজনে হারিয়ে যাই চল। কেউ যেন কোথাও খুঁজে না পায়"।

সায়নী হাসল। গোধূলির পড়ন্ত আলোয় সে কালজয়ী হাসি বোঝার ক্ষমতা তমাল সেনের ছিল না।

#

বেনারসে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে ফোনটা অন করল সায়নী। স্যার বেরিয়েছে মিটিংয়ে। তাকে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিতে বলেছে। বিকেলের মধ্যেই দিল্লির দিকে রওনা দিতে হবে। ক্লান্তি লাগলেও সায়নী অফিস ট্যুরের কথা ভেবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেডি হবার চেষ্টা করছিল।

অন হবার কিছুক্ষনের মধ্যেই ফোনটা বাজতে লাগল। আবীর। বড় বিরক্তি লাগল তার। এতো কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না।

সে ফোনটা ধরল এবার।

-বল। কি বলার আছে। তাড়াতাড়ি বল আমার কাজ আছে।

-এটা কি হল?

-কি হল?

-তুমি আসবে বললে। আমি কি তোমাকে বলেছিলাম?

-সরি কাজ পড়ে গেছিল।

শীতল গলায় বলল সায়নী।

-সরি? তুমি কি মনে কর আমাকে? হ্যাঁ? কি মনে কর? তোর বাপের পোষা কুত্তা আমি? তোর একারই কাজ আছে? আমি অফিসে সেকেন্ড হাফ বাঙ্ক মেরে গেলাম সেটা কিছু না?

-ভদ্র ভাষায় কথা বল।

-ভদ্র? তুই ভদ্রলোকের বাচ্চা? শালা খানকি মাগী। অফিসে কোন কুত্তা পেয়েছিস নিশ্চয়ই তাকে দিয়ে লাগাচ্ছিস!

-মুখ সামলে কথা বল।

আবীরের এই রূপ আগে দেখেনি সায়নী। দেখতে তো ভদ্র সভ্য ছেলের মত লাগে। এত বাজে ভাষা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

-কি বলব? তোর সাথে কি মুখ সামলে কথা বলব? তুই তোর বাপ তোর চোদ্দগুষ্ঠি খানকি।

ফোনটা কেটে দিল আবীর।

সায়নীর মাথাটা ঈষৎ টাল খেয়ে গেল। সে বসে পড়ল চেয়ারে। আবীর যেন তাকে একটা শক দিয়ে গেল এই ক'মিনিটে। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল সে দিনটার কথা যেদিন আবীর তাকে প্রপোজ করেছিল। বলা না বলার মাঝে কতকিছু বলা হয়েছিল সেদিন।

সেই ছেলেটা এমন কথাগুলি বলতে পারল তাকে?

34.

কন্ট্রোল রুমে বসে বসুর মাথা খারাপ হবার জোগাড়। রাজ্যের সবকটা জায়গা থেকে কিছু না কিছু ঝামেলার খবর লেগেই আছে। তার ওপরে উপরওয়ালার চাপ তো আছেই। একে আজকাল রাতে ভাল ঘুম হয় না,সারারাত ফোন লেগেই আছে, তারপর অপরাধ বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। চোখের সামনে খুন হতে দেখার পরে ওপরে জানাতে হচ্ছে, যদি নির্দেশ আসে তবেই গ্রেফতার করা যাবে, নইলে নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।বেশি ট্যাঁ ফো করলে সুন্দরবন ট্রান্সফার। তখন ঠেলা সামলাতে সামলাতে জান বেরিয়ে যাবে।জয়েন করার পর থেকে এই চলছে। মাঝে মাঝে মনে হয় পুলিশে চাকরি না করে মাছের দোকানদার হলে বোধহয় এর চেয়ে ভালো হত।

ফোন এল এবার মোবাইলে। নাম্বার দেখে বোস ঘাবড়ে গেল খানিকটা। এক্কেবারে বড় সাহেব।

ফোনটা ধরেই “গুড মর্নিং স্যার” বলে শুরু করতে হল।

ওপাশ থেকে জরুরি তলব এল “কাম কুইক, আমার চেম্বারে। কন্ট্রোল রুমে বাকিরা আছে তো?”

ফোনটা কানে রেখেই বোস দৌড়তে লাগল “হ্যাঁ স্যার”।

#

বিরাট চেম্বার। দেশের পতাকা আর দেশের শহীদদের ফটো দিয়ে ঘরটা ভর্তি। আর পাঁচটা দেশের পুলিশের উপরওয়ালার ঘর যেমন হয় তেমনটাই। বোস চেম্বারে ঢুকে দেখল তাদের বাকি মাথারাও চলে এসছে। সে অনুমতি নিয়ে বসতেই প্রশ্ন ছুটে এল তার কাছে “বোস, পরশু থেকে ক'টা বাউন্সড চেকের এফ আই আর এসছে? গোটা স্টেটেরটা বলুন”।

সে ঘাবড়ে গেল খানিকটা। আগে থেকে জানলে ডেটা কালেক্ট করে নিয়ে আসত। সে বলল “স্যার, আমি একটু জেনে বলি?”

অসন্তুষ্ট হলেন সাহেব। তারপরে সম্মতি দিলেন মাথা নেড়ে।

সে ফোন করল চৌধুরীকে। চৌধুরী তার সাথে একই শিফটে থাকে। “হ্যালো, আমাকে শিগগির একটু জানাতো পরশু থেকে মোট ক'টা এফ আই আর এসছে চেক বাউন্সের”?

সাহেব বললেন “আরও জিজ্ঞেস কর কাদের নামে এসছে”।

সেটা বলাতে চৌধুরী পাঁচ মিনিট সময় নিল। তারপরে যে সংখ্যাটা বলল সেটা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে বলল “রি-চেক কর। কি মাথা মুন্ডু বলছিস?”

ওপাশ থেকে চৌধুরী খিস্তি মারল একটা “বিশ্বাস না করলে করিস না, জ্বালাস না তো, আমি না দেখে বলব

নাকি?”

সে ফোনটা রেখে কাঁচুমাচু মুখে সাহেবের দিকে তাকাল। সাহেব বললেন “কি হল, হোয়াট ইজ দ্য একজ্যাক্ট ফিগার?”

সে বলল “স্যার একলাখ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন, অ্যান্ড ইনক্রিসিং ইন এভ্রি আওয়ার”।

“মাই গড। কার নামে বলল?”

“স্যার ভবতারিণী গ্রুপসের বিরুদ্ধেই সবটা, কোন কোন জায়গায় ঝামেলা শুরু হয়েছে স্যার”।

মাথায় হাত দিয়ে ফেললেন তিনি। এতটা ভাবতে পারেননি।

#

বেশ কিছুক্ষণ এক প্রাক্তন মন্ত্রী তাকে ফোন করেছিলেন “কি খবর আপনাদের?”

তিনি বললেন “ভাল স্যার। আপনি কেমন আছেন?”

-এখন তো আর সরকারে নেই। খারাপ না। বরং ভালই আছি। কাজের চাপ কম। তাছাড়া শত্রু মিত্র বুঝতে শিখছি। একেবারে খারাপ নেই বুঝলেন? এই দেখুন না, আপনাকে কখনও ভেবেছিলাম ওদের কথায় নাচবেন?

-স্যার, চাকরিটা তো রাখতে হবে বুঝতেই পারছেন।

-হ্যাঁ। তা ঠিক। আমি আপনাদের দোষ ধরিও না। যাক গে, যে কারণে ফোন করেছিলাম। খোঁজ খবর রাখছেন তো দেশের? আমাদের দলের লোকেদের মারছেন আর তাদের নামেই কেস ঠুকছেন।

-তাও আমি কিন্তু চেষ্টা করি।

-তা করুন। শুনুন, একটা কাজ করুন তো। খোঁজ লাগান পরশু থেকে গোটা রাজ্যে ক'টা চেক বাউন্স করেছে।

বোমকে গেলেন তিনি। এরকম বেয়াড়া কাজ হঠাৎ কেন!প্রশ্ন করলেন সেটাই

-কেন স্যার কি হল?

-আহা, নিন না। আপনার সাথে সম্পর্ক ভাল বলেই জানালাম, আর খোঁজ নিন কাদের এগেন্সটে হয়েছে। দেখুন ভাবুন এগিয়ে চলুন, হা হা হা হা।

-আচ্ছা।

কেটে দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

#

বড় সাহেব ভাবতেই পারেননি এরকম হিউজ ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে। ভবতারিণীর নামে রিপোর্ট কোনকালেই সেরকম ছিল না। তাছাড়া ওপর থেকে ভবতারিণীর ওপরে সিকিউরিটি দেবার ইন্সট্রাকশান ছিল। তিনি বেশ খানিকটা চাপে পড়ে গেলেন। কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। এই বাউন্সড চেকের বিরুদ্ধে এফ আই আরে গেলে অনেকের নামই জড়িয়ে যাবে। চেম্বারে বসে বসে ঘামতে লাগলেন। বোস ছাড়াও বাকিরা বসে ছিল। তিনি রীতিমত ঝাড়লেন তাদের “কি করেন আপনারা বলুন তো? আসি যাই মাইনে পাই? এত বড় একটা নিউজ আমাকে বাইরের লোকের থেকে শুনতে হয়? আপনারা থাকেন কি করতে? যান বেরন এখন, ননসেন্স যতসব”।

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল সবাই। ফোন লাগালেন এবার তিনি। তার উপর মহলে। তিন চারজন পেরিয়ে ধরলেন তার উপরওয়ালা

“হ্যালো”।

“বলুন, সকাল সকাল কি কাজ পড়ে গেল?”

“আজ্ঞে, একটা অ্যালারমিং নিউজ আছে”।

“কি?”

“পরশু থেকে ভবতারিণী গ্রুপসের নামে লাখ দেড়েকের ওপরে বাউন্সড চেকের এফ আই আর হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় অশান্তিও শুরু হয়েছে।”

“পরশু? এই দুদিন কি পেঁয়াজ ছুলছিলেন?”

“সরি মানে, এটার বিরুদ্ধে একটা স্টেপ নিতে হবে”।

“স্টেপ নিতে হবে? কি করতে আছেন আপনারা? এখনও আমার দলের লোকেরা মার খাচ্ছে, পার্টি অফিসে আগুন লাগছে সেগুলো দেখছেন? সব পড়ে আছেন ছোট ছোট ব্যাপারগুলো নিয়ে”।

“না মানে আমরা তো চেষ্টা করছি”।

“শাট আপ। মুখে মুখে কথা বলবেন না”।

“সরি”।

“ইটস ওকে। ঠিক আছে। তমাল সেন কোথায় আছে খোঁজ নিন। পেলেই জানান আমায়”।

ফোনটা কেটে দিলেন তার উপরওয়ালা। বড় সাহেব তার সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশন্ড চেম্বারে বসে দরদরিয়ে ঘামতে লাগলেন।

35.

সকালে বেরোবার আগে খেতে বসছিল বিল্টু। সাইটে যাবার আগে ভাত খেত না আগে। আজকাল খেয়ে নিচ্ছে। সাইট থেকে অফিসে যেতে যেতে খিদে পেয়ে যায়। তাছাড়া কলকাতা যেতে হবে। সুকান্ত নার্সিং হোমে ভর্তি। কোমরের হাড়ে বেশ চোট পেয়েছে ছেলেটা। সেদিন বেশ রাত হয়ে গেছিল তার বাড়ি ফিরতে। নন্দিতাদের বাড়িতে যথেষ্ট যত্ন আত্তি হয়েছিল কিন্তু এটাও বুঝতে পারছিল ভেতরে ভেতরে বউদি বেশ রেগে আছেন। তারপরে তাকে চলে যেতে বললেন। সে বুঝল না ঠিক কি করবে। সুকান্তকে ফোন করলে যখন সুকান্ত বলল সে নিজেই আসবে তখনই বিল্টু ফিরে এল। তারপরে শুনল সুকান্ত নাকি মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট করে ওই শরীর নিয়েই কলকাতা গেছিল। ফোন করেছিল অনেকবার, পায়নি। তারপরের দিন নন্দিতার বাড়ি গিয়ে জানতে পারে নার্সিং হোমে ভর্তি। একদিন গিয়ে দেখেও এসেছে। কিন্তু সুকান্তর সাথে দেখা হয়নি।

খাওয়ার সাথে টিভি দেখা বহুদিনের অভ্যাস তার। হঠাৎই একটা নিউজ চ্যানেলে এসে চোখ আটকে গেল।বেশ বড় করে ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে “ভবতারিণীর ভরাডুবি। গোটা রাজ্যে দুলাখেরও বেশি চেক বাউন্স। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি। তমাল সেন আর তার সেক্রেটারি সায়নী সাহা বেপাত্তা”।

চারদিকটা হঠাৎ যেন অন্ধকার লাগছিল তার। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না সে। এদিক সেদিক দেখে চ্যানেলটা চেঞ্জ করে দিল তাড়াতাড়ি। হৃদস্পন্দন যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে নিজের হৃদযন্ত্রের শব্দ পরিস্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। এরকমটা হত তার পরীক্ষার সময়। যে পেপারটার সাজেশন মিলত না, পরীক্ষা হলে গিয়ে যখন দেখত একটা প্রশ্নেরও উত্তর কি হবে কিছু বুঝতে পারছে না, মনে হত শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

রান্নাঘর থেকে মা-র গলা ভেসে এল “কিরে আর ভাত নিবি?”

সে কিছু বুঝতে পারছিল না কি বলবে। কোনমত চেঁচিয়ে বলল “না”। এ’দিনে মা-র চেহারা একটু ভাল হয়েছিল। সারাজীবন কেরানীর সংসার করে টিপে টিপে খরচার জ্বালা ভুলতে বসেছিল।

না বলা সত্ত্বেও ভাত নিয়ে দু হাতা তার পাতে দিয়ে মা বলল “আমি কিন্তু ওদের বলে দিয়েছি…”

সে চমকে উঠল “কাদের”?

মা তার চেহারা দেখে চমকে উঠলেন “কিরে ঘামছিস কেন এত?”

সে কথা ঘোরাল “না, এই গরমে গরম ভাত তো”।

“ওহ দাঁড়া ফ্যানটা আরেকটু জোরে করে দি”।

ফ্যানটা জোরে করে মা বলল “আরে ওই নন্দীবাড়ি”।

সে বুঝল। তার হবু শ্বশুরবাড়ি, যার সাথে তার বিয়ের কথা চলছে।

“কি বলেছ?” কোনমতে বলল সে।

“আরে শুধু গড়িমসি। আজ না কাল, কাল না পরশু, আরে আমাদের বাড়িতে তো ওদের আসতে হবে, বিয়ের দিনটা ঠিক করতে হবে না? এই রবিবার আসতে বলি? কি বলিস তুই?”

বিল্টু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল। মা আবার রান্নাঘরে চলে গেল।ভাত গলা দিয়ে নামছিল না। পায়ের পাতা, হাতের তালু সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল তার। বাবার পেনশনের পুরো টাকাটাই ভবতারিণীতে। প্রায় চোদ্দ লাখ। তার নিজের মাইনের অর্ধেকটাকা বিয়ের জন্য ফিক্সড করা আছে। তাছাড়া এলাকা আত্মীয় স্বজন মিলিয়ে খান পঞ্চাশেক লোকের ফিক্সড ডিপোজিট থেকে শুরু করে রেকারিং তার হাত দিয়েই হয়েছে।

হিসাব করে দেখল ঠিক এই মুহূর্তে তার বাড়ির আলমারিতে পাঁচ হাজার টাকা আছে। গত মাস থেকে মাইনে হয়নি। সুকান্ত কিছু টাকা দিয়েছিল। বাবার এই মাসের এম আই এসের প্রিমিয়ামটাও বাউন্স করেছে। তার মানে তারা নিঃস্ব এখন? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল বিল্টুর। এতগুলি লোকের প্রিমিয়ামের টাকার দায়িত্বও তো তার মানে তারই।

কোনমতে জল দিয়ে ভাত খেয়ে বেরতে যেতে বাবার মুখোমুখি পড়ে গেল সে। বাবা বাজার যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে বললেন “কিরে আজ কি কলকাতা যাবি?”

বিল্টু মাথা নাড়ল।

“সাবধানে যাস”।

বিল্টু বাইকটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে শম্ভুকে ফোন করল

“হ্যালো শম্ভুদা”।

-বল।

-আরে ভবতারিণী নাকি উঠে গেছে?

কথা বলার সময় তার মনে হচ্ছিল হৃদপিন্ডটা ডান হাতে উঠে এসছে।

শম্ভু বলল “তুই আজকেই কলকাতা যা”।

-হ্যাঁ সে তো আমি যাচ্ছি, কিন্তু গিয়ে কি করব?”

-সুকান্তদার সাথে দেখা কর। যেভাবেই পারিস। ও জানে না ভবতারিণীর ব্যাপারটা। ওর সবটাকা ওখানেই ফেঁসে আছে।

-আরে আমারও তো। আমার বাবার পেনশন...

বলতে বলতে গলাটা ধরে আসছিল তার।

-আরে তোর একার নাকি? আমার সব কিছুই তো ওখানে।

-এত আওয়াজ আসছে কিসের?

-ও তো রোজের মতই। তুই যা। এখনি কলকাতা রওনা দে। ট্রেনে চলে যা। গাড়ির তেলের টাকাও নেই এখন আমার কাছে।

#

বাইকটা রেখে স্টেশনে ঢুকতেই বাবার ফোন এল। সে বুঝতে পারছিল না ধরবে নাকি। শেষমেষ ধরল। ওপাশ থেকে বাবার উদ্বিগ্ন গলা ভেসে এল "কিরে, কি সব শুনছি?"

সে বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করল "না না, অত কান দিও না, আর টিভিও দেখো না। ওসব ফালতু খবর দেখাচ্ছে"।

-কি যে বলছিস! পলটু, মিঠু সবাই তো বাড়ির বাইরে। যা নয় তাই বলে গালাগাল দিচ্ছে। তুই পারলে এখনি বাড়ি আয়।

বিল্টুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছিল। তবু কোনমতে বলল "ওদের বল আমি কলকাতা গেছি রাতে আসছি।তখন কথা হবে"।

বাবার ফোনের অপেক্ষা না করেই ফোনটা কেটে দিল সে। ফোনটা ছাড়তেই আরেকটা ফোন, শম্ভু আবার। স্টেশনের লোকের ভিড়, চারিদিকে ব্যস্ততাগুলি মনে হচ্ছিল সব যেন তাকেই ধরতে আসছে। সবাই বলছে "ধর ধর, ওই চোর, ওই চোর"।

আগেরদিনই পল্টুরা যে ভাষায় তাকে ঘিরে ধরেছিল এখনকার তীব্রতা তার থেকে নিশ্চয়ই দশগুণ বেশি হবে। ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে শম্ভুর উত্তেজিত গলা ভেসে এল "বিল্টু তরুণদার লোকজন সুকান্তর বাড়ি ঘিরে ধরেছে। আমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেখেছি। জানি না কতক্ষণ সামলাতে পারব। বাইরে বোমাবাজি শুরু হয়েছে। তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস কলকাতা যা"।

তুমুল হট্টগোলের মধ্যেই ফোনটা কেটে গেল। বিল্টু বুঝতে পারছিল না, তরুণদা তো সুকান্তর দলেরই লোক, হঠাৎ ও সুকান্তর বাড়ি অ্যাটাক করতে বলবে কেন। দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে আপ শেয়ালদা লোকাল দাঁড়িয়েছিল। সে

হিসাব করে দেখল এক নম্বর থেকে দু নম্বরে যেতে হলে তাকে ওভারব্রিজ পেরিয়ে যেতে হবে। তাতে আর এই ট্রেনটা ধরা যাবে না।তাড়াহুড়োতে পানের পিক আর এক্সপ্রেস ট্রেনের পেচ্ছাপ পায়খানায় ভরা রেললাইনে সে যখন নামল তখন মাথা একেবারেই কাজ করছিল না তার। শুধু মনে হচ্ছিল তাকে এখনই কলকাতা যেতে হবে। যেভাবেই হোক।সবাই তার পেছনে লেগেছে। একমাত্র কলকাতা গেলেই তার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

চারদিক থেকে কোন লোক কি বলছে, কোনকিছুই তার কর্ণগোচর হচ্ছিল না। পাখির চোখ মনে হচ্ছিল ভিড়ে ঠাসা আপ শেয়ালদা লোকাল। সুকান্তই তাকে বাঁচাতে পারবে এই পরিস্থিতি থেকে কেন জানে না, এই অন্ধবিশ্বাসটাই মনে বারবার ঘুরে ফিরে আসছিল। বাবার টাকা লোকের টাকা সবই উদ্ধার করা যাবে কলকাতা গেলে।

আর এই সব চিন্তার মধ্যেই চারদিকের লোকের সতর্কবাণী কোনকিছুই সে শুনতে পেল না। লাইনে নামার সেকেন্ডের মধ্যেই কখন যে বিপরীত দিক থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস তাকে পিষে দিয়ে চলে গেল সেটা বোঝার আর অবকাশ পেল না সে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো কিছু লোকের জামা কাপড়ে রক্ত ছিটকে এসে লাগল কেবল। ট্রেন চলে যাবার পর দলাপাকানো শরীরটা পড়ে রইল লাইনের ধারে। শরীরটাই দেখা গেল। মৃত স্বপ্নগুলি কেউ আর দেখতে পেল না...

36.

সায়নী বসে ছিল চুপচাপ। রাতে তাদের দিল্লি যাবার কথা ।তমাল সেন বলে গেল এসে। সে বুঝতে পারল না তাকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে। কোন মিটিংয়েই তাকে থাকতে হয় না। বেনারসে যে দুটো দিন থাকল ঘর থেকে বেরনোও বারণ, ফোন অফ করে রাখতে হচ্ছে, টিভিও নেই ঘরে। এমনিতেও আবীরের সাথে কথা বলার পর সে ফোন অফ করে রাখাই ঠিক করেছে।

দুপুর কাটলে তমাল সেন বেরল আবার। সায়নী ফোনটা তাড়াতাড়ি অন করল। বাড়িতে ফোন করা হয়নি।

দুটো রিং হতেই মা ধরল, রীতিমত উদ্বিগ্ন গলায় বলল “কিরে তুই কোথায়?”

সে বিরক্ত হল। বাইরে গেলেই মা অকারণ বেশি চিন্তা করে। সে তো আর বাচ্চাটি নেই এখন যে এত চিন্তা করতে হবে।

সে বলল “কেন এত চিন্তা করছ? বেনারসে আছি, রাতে দিল্লি যাবার কথা!”

মা ওপাশ থেকে কেঁদে ফেলল “সারাদিন টিভিতে দেখাচ্ছে ভবতারিণী নাকি ডুবে গেছে। তমাল সেন আর সায়নী সাহা বেপাত্তা। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তোরা নাকি লোকের টাকা চুরি করে পালিয়েছিস!”

একটা হার্টবিট মিস হল সায়নীর, “কি বলছ তুমি মা? পাগল হয়ে গেলে নাকি?”

মা কাঁদতে কাঁদতেই বলল “পাগল হব কেন? পাড়ার লোকে এদিক সেদিক আকথা কুকথা বলছে। বলছে তুই নাকি তমাল সেনের রক্ষিতা”।

সায়নী মা কে থামাল “তুমি চুপ কর তো!যে যা পারে বলুক, স্যার বেরিয়েছেন।স্যার আসলে তোমাকে কথা বলাচ্ছি। যত উল্টো পালটা কথা”।

মা বলল “যদি বাড়িতে পুলিশ আসে”?

সায়নী একসেকেন্ড থমকাল। তারপরে বলল “বলবে অফিস ট্যুরে গেছে”।

“তোমাকে কতবার বলেছি ফোনটা অফ করে রাখবে?”

তমাল সেনের গলা। সায়নী ফোনটা কেটে দিল। বলল “বাড়িতে ফোন করেছিলাম”।

তমাল সেনের চেহারা একদিনেই বেশ বিধ্বস্ত লাগছে। দাঁড়ি না কামানোর ফলে চেহারাটাও অন্যরকম হয়ে গেছে। সায়নী ভয় পেল, মার কথাগুলি শোনার পর তার মনমেজাজ একেবারে খিচড়ে গেছে। সে গম্ভীর মুখে বলল “টিভিতে দেখাচ্ছে আমরা ফেরার। ভবতারিণী বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলি কি হচ্ছে?”

তমাল সেন তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল “ঠিকই দেখাচ্ছে”।

আচমকা তার মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। মাথা আর কাজ করছিল না তার। কোনমতে খাটে বসে বলল "তবে? আমি এখন কোথায় যাব?"

তমাল সেন একটা সিগারেট ধরাল। বলল "আপাতত দিল্লি। সেখানে ক'দিন লুকিয়ে থাকা যাক। মানুষের মেমোরি একেবারে দুর্বল বুঝলে, দুদিন পরে সব ভুলে যাবে। তদ্দিন না হয় ধীরে সুস্থে বাড়ি ফির"।

সায়নীর মাথাটা দপদপ করছিল। অনেকদিন পরে মার কাছে খুব যেতে ইচ্ছা করছিল। সে বলল "আমি বাড়ি যাব"।

তমাল সেন হাসল। শব্দ করে। বলল "এখন আর তো যাওয়া হবে না সোনামণি। আমার সাথে যেতে হবে। তাছাড়া তুমি আমার সেক্রেটারি। তোমাকে ছাড়ি কি করে বল?বাই দ্য ওয়ে। তোমার মাকে বলে দাও কাউকে যেন কিছু না বলে। আর চিন্তা করতেও বারণ করে দাও। আমার সব ফিটিং আছে, কিচ্ছুটির ভয় নেই, তাছাড়া সব জায়গামত ব্যবস্থা করেই পালিয়েছি। চিন্তার কোন কারণ নেই।সাথে দুকোটি টাকা আছে। সুইস ব্যাঙ্কে এক হাজার কোটি। নাম না জানা কোন একটা জায়গায় গিয়ে আমরা বিয়ে করব। ঘর সংসার করব। তুমি আমাকে ভালবাস তো? তবে চিন্তা কি?"

সায়নী বলল "আমি বাড়ি যাব, এক্ষনি বাড়ি যাব", সে উঠে দরজা খুলতে গেল, তমাল সেন সবলে তাকে আটকাল। একটা চড় মেরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার দিকে তর্জনী উচিয়ে বলল "আমি ভালর ভাল, খারাপের খারাপ। এখানে যদি আর কোন সিন ক্রিয়েট হয়েছে, তবে আমি কিন্তু এখানেই তোকে পুঁতে দিয়ে যাব, তুই আমাকে চিনিস না"!

ছোটবেলা থেকে বাবা-মা তাকে কোনদিন গায়ে একটা হাতও দেয়নি। এই প্রথম তার গায়ে কেউ হাত দিল। দিল এমন একজন যাকে সে সর্বস্ব তুলে দিয়েছে নিজের। বিশ্বাস হচ্ছিল না প্রথমে। তার প্রিয় স্যার, যাকে সে একটু আগে অবধি পুজো করত, তার এই রূপ সে কল্পনাও করতে পারে নি।সে বিছানা থেকে আর উঠতে পারল না। গালের যন্ত্রণার থেকেও এই শকটা তাকে উঠতে দিচ্ছিল না।

তমাল সেন কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল "ড্রামা না করে সন্ধ্যের মধ্যে রেডি হয়ে থাকবি, তুই কি মনে করিস,তোকে নিয়ে আমি কি করব? আই নিড সেক্স বুঝলি? আমি একা একা থাকতে পারি না। আমি তমাল সেন, কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক।তোর মত একটা কচি মালকে দুদিন ধরব তারপর ডাস্টবিনে ছুড়ে দেব বুঝলি?"

সায়নী বিস্ফারিত চোখে শুনছিল। সে কখনও ভাবতেও পারেনি, স্যুটেড ব্যুটেড দামী পারফিউমের আড়ালে এরকম একটা ভয়ঙ্কর লোক লুকিয়ে থাকতে পারে। অথচ সায়নী একে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছে ! সে শোকে দুঃখে

বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

#

রাতে রেডি হয়ে তারা বেরতে যেতেই দরজা সশব্দে কেউ নক করতে লাগল। সায়নী দরজা খুলতে কুড়ি পচিশজন পুলিশ ঘরে ঢুকে তাকে ঠেলে সরিয়ে তাদের দিকে রিভলভার তাক করল।

সব থেকে সিনিয়র অফিসারের চাউনি সরাসরি তার শরীরে এসে লাগছিল। তিনিই বাঁকাস্বরে বললেন “বাহ, বেশ ভালই কৃষ্ণলীলা চলছে তো রে। কি নাম আপনার? সায়নী সাহা?”

সায়নী কিছু বলল না। এমনিতেই সে শকের মধ্যে ছিল। পুলিশ দেখে সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। সিনিয়র অফিসার তমাল সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন “চলুন, এবার আপনাদের মামাবাড়ি যাওয়া যাক, কংস মামা কি বলেন?”

হো হো করে হেসে উঠল বাকি পুলিশেরা।

#

হাওড়া স্টেশানে ট্রেনটা যখন পৌঁছল তখন মাঝরাত। কিন্তু স্টেশনে সাংবাদিক সহ বহু লোকের গিজগিজে ভিড়। সারারাস্তা অনেক কেঁদেছে সায়নী। তমাল সেন গম্ভীর মুখ করে বসেছিল। শুধু মাঝখানে একবার যখন বলেছিল “আপনারা কিন্তু খুব ভুল করছেন, জানেন না আমি কিন্তু টপ টু বটম সবাইকেই চিনি”, তখন ওই সিনিয়র অফিসার তাকে কষিয়ে একটা থাপ্পড় মারেন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের বুম তাদের দিকে তাক করা। তমাল সেন একটা কথাও বলল না। সায়নী সঙ্কুচিত হয়ে ছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারছিল চারদিকের দৃষ্টি তাকে চোখ দিয়েই ধর্ষণ করে চলেছে। তবু এই সময়ে বেশ খানিকটা শক্ত হয়েছে সে। ঠিক করে ফেলেছে, পুলিশ যা যা জানতে চাইবে যা জানে তার সবটাই বলে দেবে। যেটুকু ভালবাসা ছিল তমাল সেনের প্রতি তার পুরোটাই চলে গেছে তার। পুলিশ যখন তাদের ভ্যানে তুলছে, হঠাৎই শুনতে পেল ভিড় থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল “ওই দেখ, লোকের টাকা মেরে তমাল সেন হানিমুন করতে গেছিল মাগীটাকে নিয়ে”, কেউ বলে উঠল “ওই বেশ্যা তোর রেট কত বে?” ভিড়ের কারও লক্ষ্যই তমাল সেন নয়। সবাই যেন তাকেই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। সবার দৃষ্টি কেবল তার শরীরেই। যতটা না লোকের টাকার ওপর শোক, সে শোক যেন পুরোটাই পরিবর্তিত হয়ে তার শরীরের ওপর পাশবিক উল্লাসে ধরা পড়ছে। ক্লান্ত হয়ে মাথা নিচু করে বসল সে।

৩৭।

নিজের ঘরে পায়চারি করছিলেন সুরজিত শিকদার। ঝিমলি কনসিভ করেছে। বেশ ভাল দিন যাচ্ছে আজ। বাচ্চা হবার সময় অবধি মেয়েটা এখানেই থাকবে। জামাই বিদেশ যাবে প্রায় দুবছরের জন্য।

সুকান্তর খবরটা কানে এসছে। ঠিক খুশি হতে পারছিলেন না তিনি এত আনন্দের দিনেও। ছেলেটা গোঁয়ার-গোবিন্দ ছিল। কিন্তু ভেতরে একটা চাপা আগুন ছিল। তখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত। ট্রেনে ফেরিওয়ালার কাজ করত। চাকরির খোঁজে আসত।দিতে পারেননি। নিজেয় ভায়রার ছেলের চাকরির ব্যাপারেও তার স্পষ্ট যুক্তি আছে। দীর্ঘদিন পার্টির হয়ে কাজ করে এসেছিলেন। একটা কানাকড়িও নেন নি। যেদিন বুঝেছিলেন ডুববে এবার পার্টি, তখনই নিজের লোককে কাজে ঢুকিয়েছিলেন। স্বজন পোষণ অবশ্যই। কিন্তু সে কারণে এক মিনিটের জন্যও নিজেকে দায়ী করেন না তিনি। নিজেও খুব ভাল করেই জানেন তার পার্টির এক একজন নেতা শুধুমাত্র বুকনি মেরে কি পরিমাণে আখের গুছিয়ে নিয়েছে।

ফোন বাজছে। নম্বরটা দেখে একটু চমকেই গেলেন। শঙ্কর ঘোড়ুই। অপ্রত্যাশিত। ধরলেন “হ্যালো”।

-সুরজিত বাবু বলছেন?

-হ্যাঁ বলুন।

-আপনার সাথে একটা জরুরি কথা ছিল।

-কি?

-একটা ডিল। যদি আপনি রাজি থাকেন।

ভুরু কুচকাল সুরজিতের।

-কি বলুন তো?

-পম্পা মার্ডার কেসে আপনাকে তরুণের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে।

-তাই? কিন্তু আমি এর বিনিময়ে কি পাব?

-মহার্ঘ্য একটি বস্তু।

-কি সেটা?

-লোকসভার টিকিট।

-ওহ। তাহলে তো বসতে হয়।

-কোথায় বসবেন বলুন?

-কলকাতায় যাব না হয়। বাড়ি আপনার।

-ঠিক আছে। কাল আসুন। আর হ্যাঁ। ভবতারিণী নিয়ে তরুণ যে সমস্যাটা তৈরি করছে সেটা কি করা যায়?

-তরুণকে আজই গ্রেফতার করান। পাঠকপাড়ার দায়িত্ব তারপর আমি নিলাম।

-বেশ। আমি ইন্সট্রাকশান পাঠিয়ে দিচ্ছি হাইকম্যান্ড থেকে। দেখুন, শ্মশান হয়ে যাওয়া পাঠকপাড়াকে বাঁচাতে পারেন কিনা!

-আরেকটা কথা।

-বলুন।

-সুকান্ত কেমন আছে?

-গোল্লায় যাক। মিড পয়েন্ট নার্সিং হোমে ভর্তি। ওর বউ আমায় টাকার জন্য ফোন করেছিল। কাটিয়ে দিয়েছি।

-হ্যাঁ। ওর বাড়িতে তরুণের লোকেরা ভাঙচুর করেছে। শম্ভু বলে ওর অফিসে একটা ছেলে কাজ করত, ওকে গণধোলাই দিয়ে মার্ডার করা হয়েছে।

-সব চার্জ তরুণের এগেন্সটে করে দিচ্ছি।

-কিন্তু সুকান্তর কি হবে?

-আপনিই বলুন।

-ওর জন্য টাকা পাঠান। সুস্থ করুন।

-তাতে লাভ?

-একটা পরিবার বাঁচবে।

-একমিনিট এক মিনিট ওর তো আপনার বিরুদ্ধেই যত রাগ। আর আপনি এ'কথা বলছেন?

-জানি না কেন বললাম। কিন্তু কেন জানি না রাজনীতি করতে আজ আর ইচ্ছা করছে না।

-ঠিক আছে। অ্যাস ইউ উইশ। তরুণ কিন্তু উঠছে আজই।

-হ্যাঁ। তুলুন। আমি আছি।

শঙ্কর ঘোড়ুই ফোনটা কাটলে বেশ কিছুক্ষণ নিজের চেয়ারে বসলেন সুরজিত শিকদার। ছোটবেলা থেকে রাজনীতি করেন তিনি। স্বাধীনতাউত্তর যুগে তখন বাঁচার জন্য যত সংগ্রাম। "লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই" স্লোগানের মর্মার্থ তার থেকে ভাল কেউ জানে না। বাবা শিক্ষকতা করতেন। মাইনে ছিল না বললেই চলে। আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেছেন বহুদিন।

দল সরকারে আসার পর মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। বেনোজল কাকে বলে তখন জানতেন না। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলেন সরকারে থাকা মানে আসন টিকিয়ে রাখা। ভোটের জন্য লড়া। ভোট আসল। কাজ না। কখন যে বিচ্যুত হয়েছেন বুঝতে পারেন নি।

মেয়েটার দিকে নজর দিতে পারতেন না। এদিকে মেয়েটা পেল মায়ের রূপ। সুন্দরী। কিন্তু বড় জেদী। সুকান্তর যে মেয়ের দিকে দৃষ্টি ছিল বুঝেছিলেন। দুয়েকবার সতর্কও করেছিলেন। তবু বোঝেননি অনেক কিছুই। মেয়ের বিয়ের দিন তাকে অবাক করে দিয়ে মেয়ে বলল সে সুকান্তকে ভালবাসে। কাকপক্ষীকেও সেকথা জানতে দেন নি তিনি। খোকনকে দিয়ে সুকান্তকে পেট ভর্তি মদ খাইয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে কলকাতার এক পার্টি অফিসে আটকে রাখা হয়। ঝিমলির বিয়ের দুদিন পর ছাড়া হয় তাকে।

ঝিমলি সুকান্তকে ভালবাসে একথা কি জানত সুকান্ত? জানেন না তিনি। তিনি শুধু জানতেন বয়সের দোষে অনেক কিছু ভাল লাগে। কিন্তু সময় গেলে ফিকে হয়ে যায় সবই। খোকনকে যে সুকান্ত সুযোগ পেলেই মারত সে কথা জানতেন তিনি। সে কারনেই তরুণের কাছে শেল্টার চেয়েছিলেন। তরুণ তাও বাঁচাতে পারল না খোকনকে। ছেলেটা অনেক কাজে সাহায্য করত।

সুকান্তকে মেরে দেবার এর থেকে ভাল সুযোগ পেতেন না, কিন্তু অনেকদিন পর তার গুরুর কথা মনে পড়ে গেছিল। যে সময়টা ক্ষমতায় এসেছিল তাদের দল, তার আগে অনেকেই মার খেয়েছিল। তারা পালটা মার দেবার জন্য যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন শৈবালদা বলেছিলেন "শোন বাবা, কমিউনিস্ট পার্টি করতে আইছস, মানুষের লগে থাক। মানুষের জন্য কাম কর। মানুষের এগেইন্সটে গেলে আর এই পার্টি করনের কি আছে? তাইলে কমিউনিস্ট পার্টি আর শুয়োরের পার্টির মধ্যে তফাৎ কি আছে?" না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল লোকটা। পার্টির জন্য বিয়েও করেননি। সেই পার্টিই দেখল না। অন্য দল থেকে লোকে ভর্তি হওয়া পার্টি তখন ভোটের জন্য ব্যস্ত।

সেই পার্টি তিনি এখন করেন না। কিন্তু হঠাৎ করে সে কথাগুলো বুকে এসে ধাক্কা মারল যখন শঙ্কর ঘোড়ুই ফোন করছিল।

আর কি ভাবে ভুলবেন তিনি অ্যাক্সিডেন্টের পর সুকান্ত যখন তার খাটে এসে শুয়েছিল তখন ঝিমলির সেই দিশেহারা চোখ? মেয়েটা যে এখনও সুকান্তকেই ভালবাসে। দীর্ঘদিন রাজনীতি করা লোক তিনি। আবেগ টাবেগ

হঠাৎ করে আসে না। কিন্তু সেদিন নিজের ওপর বেশ খানিকটা লজ্জা এসেছিল। তিনিই তো বলেছিলেন তরুণকে সুকান্তর নামে কেস করার জন্য যাতে ছেলেটা জড়িয়ে যায়।

ভালো করেই জানেন নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়ে নিঃস্ব সুকান্ত আবার তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। লড়াই করবে। তিনি প্রস্তুত।

নিজেকে অন্তত এই বলে ভবিষ্যতে প্রবোধ দিতে পারবেন সারাজীবনে অন্তত একবার সাচ্চা কমিউনিস্ট হতে পেরেছিলেন সুরজিত শিকদার...



এ সময়ের গদ্য-পদ্য

ভোকাট্টা!

দৃষ্টিছায়া এলাকা

ভাগ ডিকে বোস

একটি কবিতা ও তার হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত

পান্থজনের সখা

এ কেমন শুভ্র অবয়ব?

যাত্রাকালীন

এক স্বপ্নের মৃত্যু

এই মৃত্যু উপত্যকা তাঁর দেশ নয়

সেলাম ক্যাপ্টেন ফ্যাতাড়ু/ নবারুণলোকে/ পান্ডুলিপিরা পুড়ে যায় না

নবারুণ ভট্টাচার্য- বাক্য মধ্যবর্তী নীরবতা

কেন পুনরাধুনিক কবিতার কথা?

উৎপত্তিগত ব্যাখ্যা-প্রবাদ প্রবচন

কয়েকটা অপরিষ্কার ডায়েরির পাতা?

জাদুকরের কলম

হুমায়ূন আহমেদের ছোট গল্প এবং তার চরিত্রেরা

আজ আমি কোথাও যাবো না...

একটি সহজবোধ্য ব্যাখ্যা

অসমাপ্ত রিপোর্টিং , লোকাল-ট্রেনঃ কলকাতা থেকে লিখছি

শরশয্যা উপান্তে

ওয়ার্ল্ডকাপ

প্রসঙ্গঃ রবীন্দ্রনাথ

নজরুল

বিভেদ যেথায় সুরেতে মিলায়...

নজরুল কি প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছেন

নষ্ট সময়ের উপাখ্যান